সমাজ, সংস্কৃতি, নারী — ১

পিঞ্জরে বসিয়া

কল্যাণী দত্ত

স্ত্রী ।। কলকাতা ৭০০ ০২৬

প্রথম প্রকাশ
জানুযাবি ১৯৯৬

শব্দগ্রন্থন
পেজমেকার্স
২৩বি, রাসবিহাবী অ্যাভিনিউ
কলকাতা ৭০০ ০২৬

মুদ্রণ
ওয়েবইমপ্রেশনস
৩৪/২ বিডন স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রকাশক
শ্রী
মন্দিরা সেন
১৬ সাদার্ন অ্যাভিনিউ
কলকাতা ৭০০ ০২৬

অগ্নিশিখা নিবে গিয়ে থাকে যদি
ক্ষমা কোর তবে।

সূচি

লেখিকার কথা

মহিলা প্রসঙ্গে আমার পুরোনো লেখা নির্বাচিত হয়ে প্রকাশিত হল। কালিকলমের লেখা থেকে কত যত্ন পরিশ্রম এবং ঝঞ্ঝাট পেরিয়ে একটি বই তৈরি হয় সে ব্যাপারে আমার কোনোই জ্ঞান নেই। স্ত্রী প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসে প্রকাশের সব দায়িত্ব নিয়ে আমাকে চমৎকৃত করেচে। চোখের ও স্বভাবের দোষে আমার লেখায় নানা ধরনের অগুণ্তি ফাঁক থাকে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব উইমেন্স্ স্টাডিজের অভিজিৎ সেন প্রচুব পরিশ্রম করে সেগুলো সম্পূর্ণ করে দিয়েচেন। কৌতুকরসের ভাণ্ডারী বিদুষী অধ্যাপিকা ডঃ নবনীতা দেবসেন এই বইয়ের জন্য একটি ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে সবিশেষ অনুগৃহীত করেচেন। এঁদেব প্রত্যেককে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

পিঞ্জরে বসিয়া শুক কমলকুমার মজুমদারের একটি উপন্যাস। কিন্তু এই শব্দগুলি যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের *পদ্যপাঠ* প্রথম ভাগের কোনও অজ্ঞাতনামা কবির পদ্য থেকে নেওয়া। পিঞ্জরে বসিয়া শুককে আমার পরাধীন নারী বলে মনে হয়েচে। তাই নামটি আমার পছন্দ। মূলের প্রথম স্তবকটি এই—

পিঞ্জরে বসিয়া শুক, মুদিয়া নয়ন
কি ভাবিছ মনে মনে? অথবা তোমার
ভাবনার বাস্তবিক আছে অধিকার
পরাধীন বন্দীভাবে রয়েছ যখন।

ডিসেম্বর ১৯৯৫

কল্যাণী দত্ত

ভূমিকা

হঠাৎ একদিন *দেশ* পত্রিকায় একটা লেখা পড়ে চমকে গিয়েছিলুম। এই অনাস্বাদিতপূর্বা লেখিকাটি কে? 'খাঁচার পাখির' বোল-চাল, রং ঢং সবই আলাদা। 'গোঁফে, গড়গড়ায়, আর পাখিতে মিলে তবেই না বাবু!'-কল্যাণী দত্তের লেখাতে ঠিক সেই মিলনটিই ঘটেছিল, গোঁফে, গড়গড়ায়, আর পাখিতে মিলেমিশে একত্তর হয়ে বাবুয়ানির ছবিখানি দিব্যি পষ্ট ফুটে উঠেছিল। *দেশ* পত্রিকাতেই পড়লুম 'সেকালের ভেতরবাড়ি'। কিন্তু ঐটুকুনি পেয়ে পরিতৃপ্তি হয়নি, খিদেই বেড়ে গিয়েছিল মাত্তর। তবু মনটা খানিক ভরলো যখন *থোড় বড়ি খাড়া* আমাদের পাতে পড়লো 'থীমা'র কল্যাণে। ওই অদ্বিতীয় বইয়ের এর চেয়ে বিভ্রান্তিকর নাম হতে পারতো না। পাতায় পাতায় চমক্‌দার—যেমনি তার কথা, এতই পুরোনো যে তার 'অ্যান্টিক ভ্যালু' হয়ে গেছে—তেমনি তার বার্তা, কল্যাণী দত্ত না বললে কেউ তা বলতেন কিনা কে জানে? এক একখানি নিবন্ধের এক এক রকম সোয়াদ—পেত্যেকটির ভেন্ন বন্ন। ভেন্ন 'তার' —আহা জিবে পড়লে মিলিয়ে যায়, কেবল টাগ্‌রায় সোয়াদটুকুন লেগে থাকে দিনের পরে দিন। কথায় বলে 'বড় লোকের বাড়ির মোয়াটুকুও পোলোয়া'— কল্যাণী দত্তের লেখা হচ্ছে ঠিক তাই। তাঁর অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যে, কলমে যা বেরোয় তাই হয়ে ওঠে মহার্ঘ। *থোড় বড়ি খাড়া* পড়ে বিমোহিত হয়েছিলুম। আহা, এমনতর পড়তে-ভালো বই কদ্দিন বাংলাতে পড়িনি! আহা, এমনতর দেখতে-ভালো বই কদ্দিন বাংলাতে হাতেও করিনি! যেমনি রসে টইটুম্বুর লেখা, তেমনি প্রাণমাতানো ছাপাই, বাঁধাই, আর পাতার পর পাতা কালিঘাটের পোটোদের ঢঙে আঁকা শাদায় কালোয় জগৎ আলো করা সব ছবি! পূর্ণেন্দু চিত্রীর কীর্তি। বইটা হাতে করে নাড়তে চাড়তেও সুখ, আর চাখ্‌তে তো স্বর্গসুখ। লিখছেন মাছ, খাচ্ছি যেন অমৃত! আহা কী জিনিসই পড়লুম।

পড়তে পড়তে কল্যাণী দত্তকে কখন যেন আমাদেরই ভেতরবাড়ির একজন বলে ধরে নিইচি! ঠিক আমাদের ঠনঠনে কালিতলার (আমার বাপের বাড়ির) ভাষা, আর ওঁর দেখা শোনা জিনিসগুলো যে আমারো শোনা, দেখা। পুরোনো কলকাতার পুরোনো বাড়ির আদত তো আমারও খুব চেনা। কল্যাণী দত্ত লিখেচেন ঘটিবাড়ির আটপৌরে ব্যাপার স্যাপার। যা আর দেখতে পাইনে, আর শুনতে পাইনে। আমাদের ছেলেপুলেরা যা শোনেনি, দ্যাখেনি, এমন কি আমার অনেক সমবয়সী বন্ধুবান্ধবদের কাছেও যে-

জগৎ একেবারেই অপরিচিত, কল্যাণী সেই জগৎটার দোর খুলে ধরেচেন। বয়সে তিনি আমার গুরুজনস্থানীয়া, আবার তাঁর চেয়েও চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের বড়ো গিন্নিদের মুখের কথাগুলি ধরে দিয়েচেন পাঠকদের সামনে, আমিও যে আমার চেয়ে ষাটসত্তর বছরের বড়ো ঘটি গিন্নিদের আওতায় বড়ো হইচি। (পিসিমাই ছিলেন আমার চেয়ে পঞ্চান্ন বছরের বড়ো। বড়োমাসিমা বাষট্টি বছরের বড়ো। দীর্ঘায়ু দিদিমার মুখের ভাষাটিও আমাদের পষ্ট মনে আছে—আমরা ভাইবোনেরা যখন কাজকর্ম্মের বাড়িতে জড়ো হই তখন সেই সব কথা নিয়ে হাসির হুল্লোড় ওঠে।) তাই কল্যাণী দত্তর কণ্ঠস্বরটি আমার অতি পরিচিত। আমাদের ঘরদোর, রান্নাভাঁড়ার, গয়নাগাঁটি, বিয়ে থা, যজ্ঞিবাড়ি, তত্ত্বতালাশ সবই তাঁর চেনা। তাঁর কলমে আমাদেরই মাসিপিসি ঠান্‌দির মুখের ভাষা, আমাদের পুরোনো কলকাতার ভেতরবাড়ির গপ্পো। যে ভাষা, যে গপ্পো এখন আর শোনা যায় না। ১৯৪৭-এর পরে কলকাতার ঘটি-ভাষায় আর পূর্বপাকিস্তানের বাঙালভাষায় মিলেমিশে একটা জগাখিচুড়ী ভাষা তৈরি হয়েছে, আমরা সকলেই যেটা ব্যবহার করি। এখন কলকাতাতে ঢাকার লোকও বলে ফেলেন 'বেশ খেলুম'—আর শ্যামবাজারের মানুষ বলেন 'ফিরে আস্‌লাম'। কারুরই কানে লাগে না। এই ভাষার না আছে চালচুলো, না জাত গোত্তর। কল্যাণী দত্তের ভাষায় আবার নতুন করে আমার বাপের বাড়ির আদুরে হাতের ছোঁয়াটি পেলুম। (আঃ! যেন পরাণে হাত বুলিয়ে দিলে গা!) মাঝে মধ্যে শ্রীশাঁটুল গুপ্তের মুখে ছাড়া পুরোনো কলকাতার মিঠে ভাষাটি আর শুনিনে।

একনিমেষেই কল্যাণী দত্তর ভক্ত হয়ে গিয়েছিলুম—একসঙ্গে ছ ছ'টি বিশেষ গুণ এমন চোখে আঙুল ফুটিয়ে দেয় ক'জনের লেখায়? এক তো গেল ভাষার জেল্লা। দুই, তাঁর নজর! চোখ, কান দুটোই এমন খোলা, এত তীক্ষ্ণ, এত কোমল! তিন, তাঁর কৌতুকপ্রবণতা—যাতে একই সঙ্গে বারমহলের বিদ্যে আর অন্দরমহলের বিদ্যে, দুটোই মিশেছে। সংস্কৃত শ্লোক আর মেয়েলী ছড়ায় যাঁর সমান অধিকার, এমন মানুষ ক'জন আছেন? চার, তাঁর প্রজ্ঞা—পরম বিদুষী মহিলাটি তাঁর জ্ঞানকে সবিনয়ে ধারণ করে আছেন। ঠিক যেন শাঁখা-নোয়ার মতন আটপৌরে করে পরে আছেন, যা নজর কাড়েনা। কাজটি মোটেই সহজ নয়। আগুনটুকু দেখা যাবেনা, কিন্তু জ্যোতিটা ঠিকই ফুটে বেরুবে। পাঁচ, তাঁর অসামান্য দূরদৃষ্টি। আজকের পশ্চিমী বিদ্বজ্জগতে oral history খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠাঁই পেয়েছে, বিশেষত মেয়েদের ইতিহাস ও অন্যান্য নিম্নবর্গীয় মানুষের ইতিহাসের প্রসঙ্গে। কল্যাণী দত্ত এই বিদেশী হাওয়া ওঠবার অনেক আগে থেকে নিজের উৎসাহে মেয়েদের জীবনকথার মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলেন, তার অনেক কিছুই তাঁর তীক্ষ্ণ স্মৃতিতে ধরা আছে, আর অনেকখানি আছে কাগজপত্রে লিখে রাখা। 'নারীবাদ', বা উইমেন্স স্টাডিজ এসবের তোয়াক্কা করেননি কল্যাণী দত্ত, শুধু স্বচক্ষে দেখা নারীদের জীবন থেকেই তাঁর এই কাজে উৎসাহ জন্মেছিল। ছ'নম্বর—তাঁর লেখাতে কেবলই গয়নাগাঁটি রান্নাভাঁড়ার, পাখিপোষা, তত্ত্বসাজানোর খবর নেই—অন্দরমহলের 'দোয়াতকলমের' সংবাদটাও তিনি বাদ দেননি। এবং সেখানে একসঙ্গে

অনেকের অনেক কথা বলা হয়ে গেছে। ভেবে দেখলে আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের পরিবারে এমন একজন করে মাসি পিসি মাসীমার খোঁজ পাবো সমাজের চাপে যাঁরা বিকশিত হতে পারেননি, 'অথচ এরা সার্থক হলে কারো কোনো ক্ষতি ছিল না'!

কত সহজে কত তিক্তকথা বলতে পারেন কল্যাণী দত্ত। তাঁর প্রধান গুণ এখানেই, তিনি নিজে রাগ, ক্ষোভের তীব্রতা প্রকাশ করেননি, অনেক জায়গায় মন্তব্য করা থেকেও বিরত থেকেছেন। কেবল খবরগুলি ধরে দেওয়াই যথেষ্ট। 'দোয়াতকলম' রচনাটি পড়ে অবধি মন বেশ অস্থির ছিল—আমার মতো নিশ্চয় মন অস্থির হয়েছিল আরও অনেক মেয়ের। যার ফলে এবছরে বইমেলাতে পেলুম 'স্ত্রী' প্রকাশনীর উপহার কল্যাণী দত্তর দ্বিতীয় গ্রন্থ—*পিঞ্জরে বসিয়া*। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল বইটির পাণ্ডুলিপি পড়বার। মুখে মুখে সংগৃহীত মেয়েদের জীবনকথার (oral history'র) অপূর্ব উদাহরণ বৈধব্যকাহিনীর দুটি পর্ব, শিবমোহিনী ও বিদ্যাসাগরের সংবাদ, কিম্বা সতীদাহের গপ্পো। এত নির্বিকার সুরে এতগুলো করুণ কথা, কঠোর কথা, কাঁদিয়ে দেবার মতন কথা, আর ক্ষেপিয়ে দেবার মতন কথা বলে ফেলা, এ কায়দা কেবল পুরোনো বাড়ির বৃহৎ সংসারের বউঝিরাই জানেন। ভাবখানা এই— 'ভালোমন্দের আমি কিছু জানিনি বাছা, যেটি হয়েচে সেটি ধরে দিচ্চি, এখন মন্দ কি ভালো তোমরাই বোঝো!'

থোড় বড়ি খাড়া'র মতোই এবইটি যে একটি নারীর কলমে লেখা, তা নাম না জানলেও টের পাওয়া যায়। *থোড় বড়ি খাড়ার* প্রধান সুর ছিল ঘরগেরস্থালী কথা, পুরোনো কলকাতার জীবনযাপনের একটু আঁচ দেওয়া আজকের ছেলেমেয়েদের। লেখিকার জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় ইতিহাসের মালমশলা মেয়েমহলের গালগপ্পো হয়ে যেন পেতলের পানের বাটাতে উঠে এসেছিল, খোপে খোপে এক একরকমের মশলা। এক একটি লেখা যেন এক এক খিলি মিঠে পান। কেবল একটা লেখার সোয়াদ মধুর ছিলনা—একটু যেন চূণ বেশি, গাল পুড়ে যায়—তার নাম 'দোয়াতকলম'। সেই নিবন্ধের লেখিকাই যে *পিঞ্জরে বসিয়া* লিখতে পারেন, পড়তে পড়তে তাতে সন্দেহ থাকে না। বেশ কষুটে-তিত্‌কুটে সোয়াদে ভরা। *থোড় বড়ি খাড়াতে* যেসব 'মাসিপিসি খুড়ি জেঠিদের মুখের কথা একত্তর করে ধরে দিয়ে' ছিলেন, 'গেরস্তঘরের বউ ছাড়া তাঁদের আর কোনো পরিচয় নেই'। কিন্তু *পিঞ্জরে বসিয়াতে* আরেকটু এগিয়েছেন কল্যাণী, বিদ্যাবত্তা, আর দুঃসাহসের বিনীত কিন্তু নিশ্চিত পরিচয় দিয়েছেন। 'অধিকার হরণ' বা 'মাতৃভক্তি'র মত রচনায়, 'সতীদাহের গল্প' বা 'বৈধব্যকাহিনী'র মত নিবন্ধে কল্যাণী তথাকথিত নারীবাদী কোনও মন্তব্য ব্যতিরেকেই মগজে যেটুকু নাড়া দেবার, তা দিয়েছেন। জনসমক্ষে কতগুলি ঐতিহাসিক তথ্যের উন্মুক্ত উপস্থাপনাই যথেষ্ট। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। সহৃদয় পড়ুয়ার বিবেকবুদ্ধির ওপরে নির্ভাবনায় ছেড়ে দিয়েছেন বাকীটা।

ঘরবন্দী মেয়েদের খাঁচার পাখির সঙ্গে তুলনা করে কল্যাণী বইটির নাম রেখেছেন *পিঞ্জরে বসিয়া*। এতে মেয়েদের বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের রচনা সংকলিত হয়েছে। ঠাকুরবাড়ির গৃহবধূ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী সংজ্ঞাদেবীর নিম্বার্ক আশ্রমের 'সাধুমা' হয়ে

যাবার কাহিনী যেমন আছে, তেমনি আছে 'শিবানী মা শিবরানী মা দাক্ষায়ণী মা কাত্যায়নী মা'র কথা, লেখিকার বাড়ির 'আগুনখাগীদের নাম'—যাদের প্রসঙ্গে সহজসুরে কল্যাণী কেবল একবারই বলেন, 'যৎসামান্য সম্পত্তির মালিকানা যদি বিধবাদের থাকতো, তখনই কি তাঁদের অভিভাবকহীনতার সুযোগ নিয়ে সতীদাহে সম্মত করানো হতো ?' ব্যাস এটুকুই। আর কিছু না। বাঙালী বিধবাদের নিয়ে কল্যাণীর আগ্রহ অনেকদিনের— একবার *এক্ষণ* -এ কিছু নিষ্ঠাবতী বিধবার দুঃখের কাহিনী লিখেছিলেন। তার দু'বছর বাদে বেরুল দু'জন অন্যধরনের বিধবার কাহিনী। আপন দিদি মুরলার জীবন থেকেই কল্যাণী বিধবাদের জীবনযাপন নিয়ে বিশেষ ভাবে আগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন। অনেক স্মৃতিকথা, অনেক উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন একটি বইয়ের জন্য। তারপর সব বাঙালী মেয়েদের যা হয়, তাঁরও তাই হল। উৎসাহী শ্রোতা বা পাঠকের অভাবে ক্রমে নিজের উৎসাহও কমে গেল। কাগজপত্র হারিয়ে যেতে লাগল। নেহাৎ অসাধারণ স্মৃতিশক্তি আছে বলেই, তবু তাঁর কাছ থেকে আমরা যেটুকু তথ্য পেলুম, তা অমূল্য।

সাহিত্যের সত্য আর জীবনের সত্যকে পাশাপাশি সাজিয়ে লেখেন বলে কল্যাণীর লেখায় যেমন ধার, তেমনি ভার। বইপড়া পাণ্ডিত্য আর চোখে-দেখা প্রজ্ঞার অসামান্য মিলনেই তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য। 'গল্প উপন্যাসেই পাওয়া যায় এমন কিছু জ্যান্ত চরিত্র কাছে থেকে প্রত্যক্ষ' করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল—তাই 'গত দেড়শো বছর ধরে বাংলাসাহিত্যে বিধবা নিয়ে লেখার আর শেষ নেই' বলে, 'বৈধব্যকাহিনী' শুরু করতে তাঁর বাধে না। পিসিমার ছোট জা ইন্দুমতী বা বড়মাসিমা জ্ঞানদাসুন্দরী, যিনি এগারো বছরে বিধবা হয়ে পঁচানব্বুই বছর বেঁচেছিলেন—যাঁর মত্যুর পর বাড়ির লোকেরাই বলাবলি করেছিল— 'আধপেটা খেয়ে এতদিন বাঁচল, পুরোপেট খেলে দুশো বছর বাঁচত বোধহয়' —বা 'একসূর্যে ভাত খাওয়া'র মতন গল্প পড়ার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতে হয়। দ্বিতীয়দফার 'বৈধব্যকাহিনী'তে আছে আরেক স্বাদের গল্প। ফরাসি পিসিমার অনবদ্য ছড়াকাটার গান, আছে বিধবা দিদিশাশুড়ী ভুবনমোহিনীর মৎস্যভক্ষণ আর তামাকু সেবনের মিষ্টিমধুর কেচ্ছা।

বালবিধবা শিবমোহিনীকে আবার বিয়ে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর মুখে যে বিদ্যাসাগরের কথা আমরা শুনতে পাই, তিনি টেবিলে চটিপরা পা তুলে দেওয়া বিদ্যাসাগর নন, তিনি একটি গ্রাম্যবিধবাকে ঘরকন্নার খুঁটিনাটি শেখাচ্ছেন, —পানসাজা থেকে শুরু করে, এমন কি ঝাঁটা যে জল ঝেড়ে দাঁড় করিয়ে রাখলে তাতে ময়লা জমেনা, তা পর্যন্ত ! কিন্তু কল্যাণী দত্ত কেবল এই স্নেহময় পিতা বিদ্যাসাগরের কথাই বলেননি, তাঁর 'মাতৃভক্তি' প্রবন্ধে আমরা আর এক বিদ্যাসাগরকে দেখি। মা ভগবতীদেবীর একাধিপত্যের দাপটে যাঁর স্ত্রী দিনময়ী দেবী নিজের স্বামীর সংসারে দাসীর মত কেবল খেটেই যেতেন। তাঁর কোনো ক্ষমতাই ছিল না। কল্যাণী অসংকোচে লিখেছেন 'যে বিদ্যাসাগর দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রাণপুরুষ ছিলেন, তাঁর নিজের ঘরেই তো ছিল প্রদীপের নিচে অন্ধকার'। আমরা জানতে পারি তুলনাহীন সব পুত্রপ্রেমের কাহিনী,

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় এক বৈদিক পণ্ডিতমশাই, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাহুল সাংকৃত্যায়ন—কল্যাণী দত্ত একের পর এক প্রাচ্য সংস্কৃতির নক্ষত্রকুলের ব্যক্তিগত জীবনে আলোকপাত করে দেখিয়েছেন কীভাবে তথাকথিত এই মহৎ মানুষগুলির মধ্যে সৎসাহসের অভাব ছিল। তাঁরা মা ও স্ত্রীর মধ্যে সুসমঞ্জস সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হননি, নিজেও কষ্ট পেয়েছেন, একটি নিরপরাধ মেয়েকেও কষ্ট দিয়েছেন। এবং কীভাবে পিতৃতন্ত্রের জটিল জাঁতাকলে পড়ে ক্ষমতার লোভে মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু হয়ে ওঠে। এইসব প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ পড়তে পড়তে আরও একবার খেয়াল হয় কীভাবে পুরুষমানুষের জীবন পাবলিক ও প্রাইভেট এই দুটি ক্ষেত্রে বিভক্ত, এবং তাঁরা দুই ক্ষেত্রে দুই ধরনের আচরণে অভ্যস্ত। এমন কি স্ববিরোধী আচরণেও। অথচ নারীর জীবনে এই বিভেদের সুযোগ সচরাচর থাকে না। তাঁদের যা প্রাইভেট, তাই পাবলিক, যেহেতু প্রধানত সংসারই তাঁদের জীবনযাপনের একমাত্র ক্ষেত্র। সমাজের নিয়মশৃঙ্খলা, আদব কায়দা এমনভাবে তৈরি, যাতে পুরুষের পক্ষে দু'ধরনের আচরণ সম্ভবপর হয়, নারীর পক্ষে হয়না। (এক যদি না স্বামীর কাছে মারধোর খেয়েও পাড়ার লোকের কাছে হাসিমুখে 'স্বামীগরবিনী' সেজে ঘুরে বেড়ানোটা প্রাইভেট ও পাবলিক আচরণ বলে ধরা হয়!)

'বিড়ম্বিতা' নির্বন্ধে অনেকগুলি ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারীর কাহিনী আছে—কল্যাণীর প্রিয়ভগ্নী অসামান্য মেধাবিনী মুরলার সঙ্গে আমাদের *থোড় বড়ি খাড়াতেই* পরিচয় হয়েছিল। 'ভেতরবাড়ি' লেখাটি ভিন্ন *থোড় বড়ি খাড়া* থেকে আর কোনো রচনা এ বইতে নেই। বাংলাতে (যেমন পৃথিবীর অন্য সব ভাষাতেও) নারীবিষয়ক বই লেখা এখন ফ্যাশনে দাঁড়িয়েছে এবং এর একটা নবাবিষ্কৃত বাণিজ্যিক দিকও আছে—কিন্তু কল্যাণী দত্তের বইগুলিকে এসব খোপে-খাপে মোটেই ভরে দেওয়া যায় না। *থোড় বড়ি খাড়া* এবং *পিঞ্জরে বসিয়া* দুটি ভিন্ন চরিত্রের বই—এবং প্রসাদগুণে তুলনাহীন। বঙ্গনারীর ইতিহাসের দিক থেকে মূল্যবান তো বটেই।

'থীমা'র কাছে যেমন, 'স্ত্রী'র কাছে তেমনি আমাদের ঋণ রইল, পাঠক হিসেবে তাঁদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। রসের ভাণ্ডার ও চিন্তার খোরাক একসঙ্গে পাওয়া সহজ নয়, কল্যাণী দত্তের বইতে বৈঠকী মেজাজ, বিদ্যা, বিনয় ও মেয়েলীভাষার চারচক্ষুর মধুর মিলনে সেই দুর্লভ মুহূর্তটি সৃষ্টি হয়েছে।

নবনীতা দেবসেন

কলকাতা
জানুয়ারি ১৯৯৬

শিবমোহিনী ও বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ

আমাদের দেশে বিধবাবিবাহ আইন চালু হওয়ার কয়েক মাস পরে বিদ্যাসাগর মশাই দাঁড়িয়ে থেকে প্রথম বিধবাবিবাহ দেন ১৮৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। পাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পাত্রী কালীমতী দেবী। এসব কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু ১৮৫৬ সালের পর থেকে ১৮৯১-তে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বিদ্যাসাগর মোট কজন বিধবার বিয়ে দিয়েছিলেন, কী তাঁদের নাম, কী-বা পরিচয়, তা সম্ভবত আজ অবধি সংগ্রহ করা যায়নি। যেসব পরিবারে এই বিধবাদের বিয়ে হয়েছিল, তাঁরা যদি বিধবাবিবাহকে গৌরবের মনে করতেন, এইসব বিবাহের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখতেন, তবে তালিকাটি সম্পূর্ণ করা যেত। এরকম দুটি পরিবারের কথা আমার জানা ছিল। তার একটির খুঁটিনাটি এখন আমার কাছে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। অন্যটিও পাছে হারিয়ে যায়, তাই লিখে রাখার চেষ্টা করছি।

বিধবাবিবাহ দিতে গিয়ে যেসব জটিল অভিজ্ঞতা বিদ্যাসাগরের হয়েছিল তার কিছু জীবনীকারদের বিবরণে, সমাজবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণে প্রকাশ পেয়েছে। আমি যে ঘটনাটি জানি, তাতে একদিকে যেমন সেদিনের এক বালবিধবা নারীর পরবর্তী জীবনের বহু বিশিষ্ট দিক স্পষ্ট হয়, আর অন্যদিকে অন্তত একটি বিধবার বিয়েতে যে বিদ্যাসাগর হিন্দু বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানের তোয়াক্কা করেননি, তার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে আমার লেখায় যেসব ঘটনা এবং কাহিনী আসবে, তার বেশিরভাগই আমাদের পারিবারিক গল্পের থেকে সংগ্রহ করেছি।

যাঁর জীবনের কথা লিখছি, সেই শিবমোহিনী দেবী ছিলেন আমার পিসিমা। আমার বাবা দাশরথি দত্ত তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই। ছেলেবেলায় তাঁকে আমি বহুবার দেখেছি। আমাদের বেলেঘাটার বাড়িতে তিনি বছরে একবার আসতেন, কিছুদিন থাকতেন। তাঁর জ্বলজ্বলে সুন্দর চেহারা সেই শেষ বয়সেও ছিল চোখে পড়বার মতো, মনে রাখবার মতো। তাঁর প্রকৃতি ছিল গম্ভীর, ব্যক্তিত্ব ছিল সুগভীর। কিন্তু এইসব খুব স্পষ্ট বোঝবার মতো বয়স তখন আমার নয়। পিসিমা যখন মারা গেছেন, আমার তখন বারো বছরও বয়স হয়নি। তাঁর কথা বেশিরভাগই আমি আমার দাদা-দিদিদের কাছে জেনেছি, কিছু-বা নিতান্ত বাল্যবয়সে দেখেছি বা শুনেছি। আমার অগ্রজদের মুখে মুখে পিসিমা সম্বন্ধে অনেক কথাই আমাদের পারিবারিক কাহিনীতে জমা পড়েছে। শিবমোহিনীর মতো মানুষকে নিয়ে পরিবারে বহু কাহিনী প্রচলিত থাকবে, এ তো স্বাভাবিক।

বিশেষত, বিদ্যাসাগরের মতো বিরাট মানুষের সান্নিধ্য তিনি পেয়েছিলেন, তুচ্ছ থেকে গভীর নানান বিষয়ে তাঁর শিক্ষা হয়েছিল বিদ্যাসাগরেরই কাছে, বিদ্যাসাগর দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন। যেসব ঘটনা আমার লেখায় এসে পড়বে, নথিপত্র ঘেঁটে তার তথ্যপ্রমাণ জোগানো স্বাভাবিক কারণেই আমার সাধ্যাতীত। শিবমোহিনীর মতো মানুষদের দিনলিপি অথবা আত্মজীবনী সাধারণত থাকে না ; থাকলে সম্ভবত দেশের সামাজিক ইতিহাস রচনার কাজ অনেক সহজ হতো। তবু মনে হয়, এই যে কিছু কাহিনী, কিছু ঘটনা কিংবদন্তির মতো একজন মানুষকে ঘিরে চলতে থাকে, সেই চলাটার মধ্যে তো একটা বিরাট সত্যি আছে। সেই সত্যির অবলম্বনেই আমি পিসিমার কথা লিখছি।

শিবমোহিনী দেবীর জন্ম আন্দাজ ১৮৫২ সালে। তাঁর পিতার নাম চণ্ডীচরণ দত্তমুন্সী। হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে তাঁর নিবাস। ভূসম্পত্তির মালিক তিনি ছিলেন, শুনেছি তদুপরি উত্তর-বিহারে জজিয়তি এবং পোস্টমাস্টারের কাজও তাঁর ছিল। শৈশবেই শিবমোহিনীর মাতৃবিয়োগ ঘটে। তাঁর পিতা আবার বিবাহ করেন। শিবমোহিনী যখন দশ বছরের বালিকা, তখন পিতা তাঁর বিবাহ দেন কিন্তু বিবাহের দুই বছরের মধ্যেই বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। বিমাতার নিষ্ঠুরতা তাঁর জীবনকে বিষময় করে তোলে।

বালবিধবা জীবনের স্মৃতি শেষ বয়সেও শিবমোহিনীকে ছেড়ে যায়নি। বাল্যকালে এমন সব কথা তাঁর মুখে শুনেছি: হিন্দুসমাজে বিধবাদের যেমন যন্ত্রণা তেমনটি আর কোনো সমাজে নেই। আজ আমি যেমনই থাকি, সেইসব দিনের কথা কি ভুলেছি ? তখন কেবল ঘর মুছতুম বাসন মাজতুম আর ঝগড়া করতুম।

আমার মা যখন বাড়িতে ষষ্ঠী করতেন, সেই সময় পিসিমা আমাদের বাড়িতে থাকলে বিধবা আত্মীয়াদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য একটু বিশেষ আয়োজন করতেন। তাঁর নাকি দুঃখ ছিল, ব্রাহ্মণ, সধবা, আর গরুকে খাইয়েই গোটা দেশ তৃপ্ত ; জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হিন্দুসমাজের অগুনতি অনুষ্ঠানে বিধবাদের কখনোই কিছু প্রাপ্য নেই। আমার মেজদিদি মুরলা বসুকে নাকি শিবমোহিনী বলেছিলেন, 'আমার বড় ইচ্ছে, বিধবাভোজন করাই। হিন্দুদের কোনো ক্রিয়াকর্মে তাদের তো কোনো জায়গা নেই। মানুষ গরুকে দেয়, কাককে দেয়, শিয়ালকে দেয়, গাছকেও দেয়, কিন্তু বিধবাদের কিছু পাওয়ার নেই।' তবে শিবমোহিনীর এই সাধ পূর্ণ হয়নি। বিধবারা তাঁর প্রস্তাবে রাজি হননি, বরং অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

দেবানন্দপুরে সেই বালবিধবার জীবন যখন বিমাতার শাসনে শেমিজ ছাড়া এক-কাপড়ে থাকা, সিঁড়ির তলায় খালি মেঝেতে শোওয়া, নির্জলা উপবাসে একাদশী করা—এইসব যন্ত্রণায় অসহনীয় হয়ে উঠেছে, তখন প্রতিবেশী পরিবারের মেয়ে হেমাঙ্গিনী ছিলেন তাঁর বিশেষ বন্ধু এবং সান্ত্বনাস্থল। কিছুকালের মধ্যে হেমাঙ্গিনীর পিতা সপরিবারে

ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেওয়ার সংকল্প করেন ; এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে আসা স্থির করেন। কলকাতায় বিদ্যাসাগর মশাই বিধবাদের বিয়ে দিচ্ছেন,তাই নিয়ে তুমুল কাণ্ড হচ্ছে, এসব গল্প তখন নিত্য শোনা যেত। হেমাঙ্গিনী বন্ধুকে তাঁদের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসতে পরামর্শ দেন। নিরুপায় বিধবা কন্যার প্রতি স্ত্রীর নিষ্ঠুরতা শিবমোহিনীর পিতাকে বিদ্ধ করত, কন্যার প্রতি তাঁর সুগভীর গোপন স্নেহ ছিল। আসন্ন কোনো এক পুণ্যযোগে প্রতিবেশী পরিবারের সঙ্গে কলকাতায় গঙ্গাস্নানে যাবেন, এই কথা পিতাকে জানিয়ে শিবমোহিনী গোপনে বন্ধুর পরিবারের সঙ্গে কলকাতায় চলে যান। তাঁর বিমাতা ক্রুদ্ধ হয়ে প্রচার করেন যে শিবমোহিনী কুলত্যাগ করেছেন।

কলকাতায় পৌঁছবার বেশ কিছুদিন পরে হেমাঙ্গিনী একদিন শিবমোহিনীকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বাড়ির বাইরের রোয়াকে এসে বসেছিলেন। বাজার থেকে ফিরে বিদ্যাসাগর তাঁদের দেখে বলে ওঠেন, 'ওরে দেখ্‌রে, আজ আবার কারা দুটো মেয়েকে বসিয়ে রেখে চলে গেছে।' সপ্রতিভ হেমাঙ্গিনী বলে উঠলেন, 'বাবা, দুটো নয়, একটা।' আর শিবমোহিনী লজ্জায় আর ভয়ে কেঁদে উঠলেন। ধীরে ধীরে তাঁদের মুখে সব কথা শুনে বিদ্যাসাগর বললেন, 'দেখ, বিধবাদের আমি বিয়ে দিচ্ছি সত্যি কথা। কিন্তু আমি খুব ব্যস্ত মানুষ। যা দেখছি ভালো ঘরে বিয়ে করে ঘর-সংসার করতে চাইলে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে। বাড়িতে না বলে তুমি এসেছ, ফেরার তো কোনো পথ নেই। আমার বাড়িতেই থাক। পরে দেখা যাবে।'

১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ আইন প্রচলিত হওয়ার পরে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বহু বিধবার বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেসব বিবাহের পরবর্তী অভিজ্ঞতা বিদ্যাসাগরকে বিব্রত ও বিপন্ন করে। বর্ণহিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধতা খুব কিছু হ্রাস পায়নি। আর বহু অর্থব্যয়ে বিদ্যাসাগর যাঁদের বিবাহ দিতে পেরেছিলেন, তাঁরাও অনেকেই ঠিক নিরাপদ দাম্পত্যজীবনে প্রতিষ্ঠিত হননি। পাত্ররা অনেক সময় এমন ভয় দেখাতেন যে বিদ্যাসাগর আরো টাকা না দিলে তাঁরা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবেন। এমন ঘটনাও বিরল নয় যে একাধিক পত্নী বর্তমানে তাদের স্বামী বিদ্যাসাগরকে ঠকিয়ে তাঁর দেওয়া যৌতুক নিয়ে বিধবা বিবাহ করেছিলেন।

আমার অগ্রজদের কাছে আমি শুনেছি যে শিবমোহিনী কিছুকাল বিদ্যাসাগরের বাড়িতে কাটাবার পরে বিদ্যাসাগর একদিন তাঁকে ডেকে বলেন, 'দেখ, বিয়ের সময় আমি অনেক টাকা দিই। অনেক ছোকরা তাই নিয়ে বিয়ের পরেই পালিয়ে যায়। তোমার জন্য ছোকরা পাত্তর খুঁজব না। একটি দোজবরে ভালো পাত্তর আছে। তুমি যদি সংসার করতে চাও তা হলে তার সঙ্গেই বিয়ে দিতে ইচ্ছে করি।' শিবমোহিনী সম্মত হলে বিদ্যাসাগর মশাই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে চণ্ডীচরণ সিংহের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। চণ্ডীচরণ সিংহ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ভক্ত এবং একান্ত অনুগত ছিলেন। কুচবিহার বিবাহের ঘটনার (১৮৭৭) পূর্বেই শিবমোহিনীর বিবাহ হয়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীকে তিনি বহুবার দেখেছিলেন, তাঁর ভক্তও ছিলেন।

বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তনের সময় বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহে হিন্দুমত এবং হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলাকেই একান্ত সমর্থন জানিয়েছিলেন। আইনটির বিধিব্যবস্থায় বিদ্যাসাগরের বক্তব্য প্রাধান্য পেয়েছিল। আইনটি গঠনের জন্য যে-সিলেক্ট কমিটি কাজ করেছিল, তা 'ইয়ং বেঙ্গল' প্রস্তাবিত রেজিস্ট্রি বিবাহের সুযোগ রাখার ব্যাপারটা বর্জন করে। ১৮৬২ সালে গুরুচরণ মহলানবীশ[১] বিধবাবিবাহ করতে চাইলে, সে ব্যাপারে ব্রাহ্মনেতাদের দ্বিধা ছিল। বিদ্যাসাগর গুরুচরণকে আশ্বাস দেন যে গুরুচরণ যদি সাবেকি হিন্দুমতে বিয়ে করতে রাজি থাকেন তো তিনি নিজের উদ্যোগে সেই বিবাহ সম্পাদন করবেন। বহু বঞ্চনা, বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা পেরিয়ে বিদ্যাসাগরই আবার সিভিল বিবাহ আইনের এক্তিয়ার কিছুটা বাড়িয়ে হিন্দুবিধবাদের বিবাহের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারটার সরলীকরণ চাইলেন। তিনি চেয়েছিলেন, সিভিল বিবাহ আইনের সেই বিশেষ শর্তটি বর্জিত হোক যে প্রচলিত কোনো ধর্মের প্রতি আনুগত্যে সিভিল বিবাহ অসম্ভব। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *বিদ্যাসাগর* গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) তাঁর এই ইচ্ছার উল্লেখ আছে। ওই শর্তটি বাতিল হয়ে গেলে সিভিল বিবাহ আইন মতে হিন্দুবিধবাদের বিবাহ দিতে তাঁর কিছুটা সুবিধা হতো।

গত শতাব্দীর ষাট-সত্তরের বছরগুলিতে কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী তরুণ ব্রাহ্মরা তাঁদের সংস্কার আন্দোলনে বিয়ের ব্যাপারে সবরকম আচার অনুষ্ঠানে পৌত্তলিকতা বর্জনে আগ্রহী হয়েছিলেন। তেমন কিছু বিবাহও সে সময় সম্ভব হয়। তরুণ ব্রাহ্মদের আন্দোলনের চাপেই ১৮৭২ সালে সিভিল বিবাহ আইন প্রবর্তিত হয়। শিবমোহিনীর সঙ্গে চণ্ডীচরণ সিংহের বিবাহের ব্যাপারে আমাদের পরিবারে যে কাহিনী প্রচলিত, তাতে মনে হয় বিদ্যাসাগর সেই বিবাহে ওই তরুণ ব্রাহ্মদের পথের অনুসারী ছিলেন। সে বিবাহ হিন্দুমতে হয়নি এবং বিদ্যাসাগর শিবমোহিনীকে সম্প্রদান করেননি। কিন্তু কেশবচন্দ্রের অনুগত এই চণ্ডীচরণ সিংহকে বিদ্যাসাগর নিজেই পাত্র হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন, দাঁড়িয়ে থেকে বিবাহ দিয়েছিলেন ; এবং বিবাহের সময় কন্যাপ্রতিম 'শিবু'কে মোটা অমৃতিপাকের বালা ও গলার হার ছাড়াও খাগড়ার সর্বসুন্দরী ঘড়া, কামরাঙা বাটি, মেদিনীপুরের বেলের গড়নের ক্ষীর-খাবার বাটি, যাজপুরী কাঁসি, নবাসনের থালা, পানের বাটা, ভালো যাঁতি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'দেখ শিবু, আমার ইচ্ছেমতো তোমায় কিছু জিনিস দিলাম। তুমি যেন ওখানে গিয়ে আমার বাবা এত দিয়েছে, অত দিয়েছে, বলে বড়াই কর না।' আত্মীয়স্বজনদের মুখে যা শুনেছি, তাতে মনে হয় সেই বিবাহ তখনকার কেশবচন্দ্র সেনপন্থী তরুণ ব্রাহ্মদের সমর্থিত ব্যবস্থা অনুযায়ী হয়ে থাকবে। অবশ্য এমন কোনো বিবাহের উদ্যোগে বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষ জড়িত ছিলেন, তেমন উল্লেখ সম্ভবত তাঁর কোনো জীবনীতে নেই। অন্তত আমার সেরকম কিছু জানা নেই। পারিবারিক কাহিনীর ধারায় যেটুকু শুনেছি এবং অনুমান করেছি, আমি শুধু সেটুকুই বলতে পারি।

গ্রামের এক বালবিধবার অসহায় করুণ জীবন বিদ্যাসাগরের সস্নেহ সাহায্যে কেমন বদলেছিল, তা নিয়ে কিছু কথাও শুনেছি। চণ্ডীচরণ সিংহের সঙ্গে তাঁর বিবাহের আগে বেশ কিছুকাল শিবমোহিনী বিদ্যাসাগরের বাড়িতেই ছিলেন। পিতৃগৃহে তাঁর বর্ণপরিচয় হয়েছিল, সংসারের যাবতীয় কাজকর্মও তিনি জানতেন। কিন্তু অজপাড়াগাঁয়ের কাজ আর কলকাতার কাজকর্মে ফারাক অনেক। স্বয়ং বিদ্যাসাগরের কাছেই সংসারের নানা খুঁটিনাটি কাজে শিবমোহিনীর হাতেখড়ি হল। কারণ বিদ্যাসাগর অনেক কাজই নিজের হাতে করতেন।

বৈঠকখানার সংলগ্ন ঘরে দেরাজে ও তক্তপোশের তলায় বিদ্যাসাগর নানারকম ফল, মিষ্টি, নাড়ু ইত্যাদি রাখতেন। তাঁর কাছে সমাজের প্রধান তেমন কেউ এলে তিনি নিজের হাতে বঁটিতে ফল কেটে ও মিষ্টি সাজিয়ে খেতে দিতেন। যাঁতিতে সুপুরি কেটে টাটকা পান সেজে দিতেন। এসব তিনি শিবমোহিনীকেও শিখিয়েছিলেন। খাবারের হাঁড়ির তলায় বিঁড়ে রাখা, সন্দেশের হাঁড়ির মুখে পাতলা ন্যাকড়া বেঁধে খুরো বসিয়ে জলভরা কাঁসিতে মিষ্টি রাখা, এইসব ছোটখাটো ব্যাপারে যত্ন নিতেও শিবমোহিনী বিদ্যাসাগরের কাছেই শিখেছিলেন। খাওয়ার পরেই জলখাবারের পেতলের রেকাবি মেজে, রোয়াক ধুয়ে ঝাঁটা রাখতে হতো। একবার রোয়াক ধুয়ে ঝাঁটা ফেলে রেখেছিলেন বলে শিবমোহিনী বিদ্যাসাগরের কাছে তিরস্কৃত হয়েছিলেন। কাঠির ঝাঁটা জলঝাড়া দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখলে তবেই নোংরা জমে না, বলেছিলেন বিদ্যাসাগর। সামান্য দড়িও তিনি নিজের হাতে সযত্নে পাকিয়ে রাখতেন, পুরনো কাগজ, খাম, কিছুই ফেলা যেত না। বসবার ঘরে কলম ও দোয়াতদান ঝকঝক করত। মহারানী ভিক্টোরিয়ার ছাপ দেওয়া পোস্টকার্ড, খাম, ভাঁজকরা ছোটবড় নানা মাপের কাগজ সব তিনি নিজের হাতে গুছিয়ে রাখতেন। বইয়ের আলমারিতে মোতিহারীর দোক্তাপাতা আর নিমপাতা দেওয়া থাকত। নিত্য সেই মানুষটির কাছে থেকে শিবমোহিনী ছোটবড় অসংখ্য কাজে সজাগ তৎপরতা অর্জন করেছিলেন।

শিবমোহিনীর কাজ ছিল বিদ্যাসাগরের বসার ঘর গুছিয়ে রাখা। কোথাও গেলে গাঁটরি বেঁধে কাপড়, ঝোড়া ভরে মিঠাই, কাচের চুড়ি, খেলনা আর নানারকম পেতল-কাঁসার বাসন কিনে আনতেন বিদ্যাসাগর। পরে তা যথাস্থানে বিলিয়ে দিতেন। শিবমোহিনীও এই অভ্যাসটি পেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর আদরের শিবুকে হাতে ধরে পান সাজানো শেখান। গোছাভর্তি পান বাজার থেকে এলে খুব যত্ন করে ধুয়ে ছোট-বড়-মাঝারি থাক করে সাজিয়ে ফেলতে হতো। কোন পানে খিলি হবে আর কোনগুলোতে চুন লাগানো হবে, তা পলকের মধ্যে বেছে রাখতে হতো। চুনের ভাঁড়ে রোজ সামান্য জল না দিলে খিচ্ ধরে যায়, এও নাকি বিদ্যাসাগরই শিবমোহিনীকে শিখিয়েছিলেন। সময়ের সরেশ আম তাঁর ঘরে প্রচুর মজুত থাকত। আঠালো আম কীভাবে ধুতে হবে, কোন আম কতদিন পাতায় ঢাকা থাকবে, কোন সময়ে কাকে পাশ ফেরাতে হবে তবে তা 'তয়ের' হবে, 'সকল ফল ডালে, আম খাবে পালে' এইসব শিক্ষাও নাকি আম্ররসিক বিদ্যাসাগর শিবমোহিনীকে দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের স্ত্রী দিনময়ী দেবী সারাদিন সকলরকম পরিশ্রমে আর কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু বৃহৎ সংসারের সবদিকে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল তাঁর মাতা ভগবতী দেবীর। শিবমোহিনী কায়স্থের কন্যা, তবু ব্রাহ্মণ-পরিবারের রান্না ও হেঁসেলের কাজ যতটুকু তাঁর পক্ষে করা সম্ভব, তা তিনি নতুন করে নিপুণভাবে অন্তঃপুরিকাদের কাছ থেকে শেখেন। আমার দিদিরা নাকি পিসিমার মুখেই গল্প শুনেছিলেন যে বিদ্যাসাগর উঠোনে বালতির উনুনে পাঁঠার মাংস মধ্যে-মধ্যেই নিজে রাঁধতেন। মাংসে পেঁয়াজের চল ছিল না। নিত্য ঝোল-ঝাল ছাড়াও বড়িভাতে ও বড়ির অম্বল তাঁর প্রিয় ছিল। দশ-বারো রকমের অম্বল নাকি তিনি রাঁধতে জানতেন। বেলপোড়া, বেলের মোরব্বাও তিনি খুব পছন্দ করতেন। রসকরা, রসমুণ্ডি, বোঁদে, খাজা, গজা, মুড়কি, ছানাবড়া ইত্যাদি সরেশ জিনিস কোথায় কী পাওয়া যায়, তা বিদ্যাসাগরের খুব ভালোই জানা ছিল। তিনি খেতে ভালোবাসতেন, আর তার চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসতেন খাওয়াতে।

বিবাহের পরে শিবমোহিনী স্বামীর প্রথম পক্ষের সবকটি পুত্রকন্যাকে মাতৃস্নেহে পালন করেছিলেন। তাদের বিবাহ দিয়ে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এমন-কী তাদের সন্তান-সন্ততিদেরও তিনি মানুষ করেছিলেন। তাঁর নিজের কোনো সন্তান হয়নি। অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে শিবমোহিনী ধাত্রীবিদ্যা শিখেছিলেন ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের (১৮৫৭-১৯৫০) কাছে। সুন্দরীমোহন ধাত্রীদের যে রোজনামচা[২] লিখেছিলেন, তার চারটি ঘটনা তাঁকে শিবমোহিনী দিয়েছিলেন। রোগীর সেবায় শিবমোহিনীর ক্লান্তি ছিল না, খবর পেলেই প্রসূতির কাছে ছুটে যেতেন। সেকালে ধাত্রীর কাজ যথেষ্ট নিন্দিত ছিল। কিন্তু শিবমোহিনী নিন্দার পরোয়া করতেন না। আমার সেজদিদির জন্মের সময় তিনি আঁতুড়ঘরে উপস্থিত ছিলেন। সেজদিদির জন্ম-তারিখ ৩০শে আশ্বিন। রাখীবন্ধন তখন নিকট-স্মৃতি এবং সেজদিদির জন্ম-তারিখটিতে রাখীবন্ধন উৎসবের কয়েক বছর পূর্ণ হয়ে থাকবে। ঠিক বছরটি আমার জানা নেই। পিসিমা মাকে বলেছিলেন, 'বউ, এমন ভালো দিনে জন্মাল, মেয়ের নাম রাখ রাখী।' সেজদিদির নাম অবশ্য রাখী হয়নি। অন্যান্য আত্মীয়াদের আপত্তি ছিল। আমার বড়দির মেয়ে যখন জন্মায় যশোহর জেলার ঝিনাইদায়, পিসিমা সেখানেও উপস্থিত ছিলেন। প্রবাসী স্বামীর স্ত্রীদের, কুমারী কিংবা বিধবা মেয়েদের সন্তান-সম্ভাবনা দেখা দিলে, সেই সন্তান বিনষ্ট করাই তখন সমাজের নিয়ম। শিবমোহিনী নাকি সংবাদ পেলেই ছুটে যেতেন। দুটি অবৈধ সন্তানকে তিনি বাঁচান এবং বড় করেন। একজন বাপ-মা-মরা অনাথের পরিচয়ে কোনো বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্ম-পরিবারে মানুষ হয়, শিবমোহিনী তার জন্য মাসে দু'টাকা খরচ দিতেন। পরে সিমলেপাড়ার দোকানে ছেলেটির কাজের ব্যবস্থা করে দেন। অন্য ছেলেটি যসিডি অথবা মধুপুরে মালীর ঘরে পালিত হয়েছিল। আমার মেজদি একবার পিসিমাকে নাকি শুধিয়েছিলেন, 'ছেলে না হয়ে যদি মেয়ে হতো, তবে কী করতেন?' শিবমোহিনী বলেছিলেন, 'ঈশ্বরের কৃপা যে পুত্রসন্তান হয়েছিল। কন্যা-জন্ম হলে কী হতো, তা জানিনে। কেউ তো নিত না। চামারদের ঘরে বিলিয়ে দিতে হতো।' এ কথা আমি মেজদির মুখেই শুনেছি।

সংসারের রাঁধাবাড়ার কাজ ছাড়াও মেয়েদের তিনি যত্ন করে চুল বাঁধতে, গুছিয়ে কাপড় পরতে শেখাতেন। রোগীর যত্ন, শুশ্রূষা, সব রকমের পথ্য তৈরিও তিনি মেয়েদের শিখিয়েছেন। বাঙালি ভদ্রলোকেরা তখন কেউ হাসপাতালে যেতেন না। বসন্ত অথবা কলেরার রোগী বাড়িতেই থাকতেন। টাইফয়েড ইত্যাদি কঠিন অসুখে রাত জাগবার ব্যাপার লেগেই থাকত। এসবে শিবমোহিনীর ক্লান্তি ছিল না। বিয়ের যজ্ঞি সামলানো, কুটনো, আচার বড়ি আমসত্ত্ব ইত্যাদি বানানো, সব করেও সারাদিনে যখনই সময় পেতেন তিনি কুরুশের লেস বুনতেন। খুঞ্চেপোশ থেকে বিছানাঢাকা পর্যন্ত অগুনতি বুনতেন সারা বছর। এই শিল্পকর্মটি তিনি বিয়ের পরে শিখেছিলেন।

গরিবের ঘরের বউরা যা হোক করে সামান্য কিছু টাকা জমাতে শিখুক, এটা তিনি সর্বদা চাইতেন। তাদের দিয়ে বড়ি, আচার, কাসুন্দি তৈরি করিয়ে গোপনে বিক্রি করাতেন। প্রফুল্লচন্দ্র (বুলা) মহলানবীশের মুখেও আমরা এইসব কথা শুনেছি। যেসব বউরা সেলাই অথবা বোনার কাজ জানতেন না বা পারতেন না, তাঁদের তেজারতি করতে টাকা, গহনা, বাসন গোপনে বন্ধক রাখতে শিবমোহিনী পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি নাকি বলতেন, 'মেয়েদের হাতে তো টাকা থাকে না মা, তারা কি চুরি করবে? তেজারতিতে পাপ হবে কেন?'

শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতা সম্বলিত পুস্তিকা আমার মাকে পিসিমা কিনে দিয়েছিলেন। তখনকার দিনের ঘোড়ায় টানা সেকেণ্ডক্লাস পালকিগাড়ি ভাড়া করে মাকে ২১০নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে গিয়েছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতা শোনাতে। বিদ্যাসাগর তাঁকে যে অমৃতিপাকের বালা দিয়েছিলেন, তার নকলে তিনি আমার মাকে বালা গড়িয়ে দেন। তবে তাঁর কাছে দান করার থেকে অনেক বড় ছিল স্বনির্ভর হতে শেখানো। মাকে বালা-জোড়া দিয়ে বলেছিলেন, 'বউ, তোমার হাতে তো টাকা থাকে না। দিলাম বলে মনে কিছু কোরো না। যদি ইচ্ছে কর, এক টাকা; দু'টাকা করে বালার টাকা তুমি আমাকে দিও, নিজেই হিসেব রেখ।' শিবমোহিনীর এই বিশিষ্ট কাহিনীটি আমাদের পারিবারিক সঞ্চয়ে আছে, মাকে যে বালা-জোড়া তিনি দিয়েছিলেন, তাও খুব সম্ভব এখনও আছে।

ব্রাহ্মসমাজের অনেক মানী ব্যক্তিই শিবমোহিনীকে মা বলে ডাকতেন। পাড়া জুড়ে লোকেরা মা বলত, তাই তাঁর অনেক নাতিও তাঁকে মা সম্বোধন করতেন। গিরিডিতে চণ্ডীচরণ সিংহের বাড়িতে উপাসনার শেষে মধ্যে মধ্যে দু-একটি কথাও তিনি বলতেন। কিন্তু কলকাতায় সুকিয়া স্ট্রিটে থাকার সময় কেবল মহিলাদের উপস্থিতিতেই উপাসনা করতেন। বিদ্যাসাগরের লেখা দু-খানি চিঠি শিবমোহিনীর কাছে ছিল। একটিতে বিদ্যাসাগর লিখছেন, গিরিডিতে যাবার তাঁর (বিদ্যাসাগরের) সময় হবে না। অন্যটিতে সুন্দর দু-চার ছত্র উপদেশ ছিল।

পিসিমাকে আমি যখন দেখেছি, তখন তিনি কলকাতায় সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতেই

থাকতেন। সেটি চণ্ডীচরণ সিংহের নিজের বাড়ি, নাকি ভাড়া-বাড়ি, আমি জানি না। তবে পিসিমার বাড়ি বলতে আমরা সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িটাই বুঝতাম। আমাদের বেলেঘাটার বাড়িতে কিছুদিন থাকবার পরে যাওয়ার সময় তিনি আমার দাদাদের কোনো একজনকে বলতেন, একটা রিকশা ডেকে দিতে। যৎসামান্য রিকশাভাড়া তিনি তাঁদের হাতে দিতেন। আমার যথেষ্ট গম্ভীর প্রকৃতির দাদাদের একজনেরও সাহস ছিল না, সেই সামান্য ভাড়া নিতে আপত্তি করেন, অথবা ভাড়া নিজেরাই দিয়ে দেন। মনে আছে, পিসিমা যখন আমাদের বাড়িতে থাকতেন, তিনি ঘরে ঢুকলে, দাদারা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেন।

সন্তানতুল্য ভ্রাতা দাশরথির পরিবারে শিবমোহিনীর সহজ কর্তৃত্ব ছিল। শিবমোহিনীকে আমি যখন দেখেছি, তখন কলকাতায় আমাদের বাসস্থান ছিল বেলেঘাটায়। তার আগে মদন মিত্র লেনে আর যুগলকিশোর দাস লেনেও বাবারা ভাড়া-বাড়িতে ছিলেন। তবে আমার জন্ম বেলেঘাটায়। বেলেঘাটা রেলওয়ে ব্রিজ পেরিয়ে তখন তিনটিমাত্র পাকা বাড়ি ছিল, তিনটিরই মালিক কোলে প্রপারটিস। তার মধ্যে পুব-দক্ষিণ খোলা তিনতলা বাড়িটিতে আমরা ভাড়া থাকতাম। তিনতলার সবচেয়ে ভালো ঘরটিতে ছিল মেয়েদের আড্ডা। বারোমাস কোনো-না-কোনো মাসিপিসির আনাগোনা আর থাকা চলত আমাদের বাড়িতে। শিবমোহিনী থাকলে আত্মীয়াদের পরচর্চায় বড় ব্যাঘাত হতো। পরনিন্দা শুনলেই বাঁ-হাতখানি একটু উঁচু করে বলতেন, 'থাক ওসব কথা', অমনি সবাই চুপ করে যেত। ছেলেবেলায় দেখা সেই দৃশ্য আজও আমার আবছা মনে পড়ে। পিসিমা নাকি বলতেন, 'গুজবে বিশ্বাস করবে না, একজন মানুষের মুখে নিন্দে শুনলে উড়িয়ে দেবে, সব নিজের চোখে দেখা সম্ভব না হলেও, যাঁদের কথার ওজন আছে তাঁরা বললে তবেই মানবে। কারও চরিত্তির নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। সে কী করেচে সেইটে দেখার চেষ্টা কর। কারও গুপ্তকথা জাহির করতে নেই।' এত কথা অবশ্য আমার নিজের কানে শোনা নয়, আর শুনলেও তার গুরুত্ব বুঝে মনে রাখবার বয়স সেটা নয়। পরে দিদিদের মুখে জেনেছি।

বেলেঘাটার বাড়ির দোতলার বড় ঘরটিতে একটি আজব আড্ডা ছিল। মামলা-মকদ্দমার তদ্বির করতে, গঙ্গাস্নান করতে, মোহনবাগানের ফুটবল ম্যাচ দেখতে, যে-কোনো কারণেই যত দূর-সম্পর্কের আত্মীয়রাই আসুন না কেন কলকাতায়, আমাদের বাড়িতে তাঁরা থাকতেন। ওই ঘরটিতে বারোমাসই তেমন বহু আত্মীয় সমাগম হতো। আমাদের বাড়িতে থাকাকালীন, তাঁদের তেল-গামছা থেকে শুরু করে সবকিছুর দায়িত্ব ছিল এই সংসারের। তাঁরাও যতদিন থাকতেন, আদরযত্নের অভাব নিয়ে খুব অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। মুখ থেকে খাবার ফেলে দিতেন, পছন্দমতো রান্না না হলে ; সেই শিশুকালে আমি তাঁদের অনেকের মুখেই শুনেছি, 'তোর মা আবার রাঁধতে জানে নাকি ?'

সংসারে বাবার দায়িত্ব ছিল টাকা দেওয়ার, বাকি সব দায়িত্ব মায়ের। বাবা বিশেষ কারও সঙ্গে কথা বলতেন না ; তাঁর ঘরের দরজা বেশিরভাগ সময়েই বন্ধ থাকত,

বিশেষত বাড়িতে অত্যধিক আত্মীয় সমাগম হলে। সেইসব আত্মীয়দের ভাষায় বাবা ছিলেন নিরাকার পরব্রহ্ম। বাবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। অবসর সময়ে তাঁকে ধুলোমাখা মোটা মোটা ইংরিজি বই পড়তে দেখতাম। তখন পুরোটা না বুঝলেও, পরে জেনেছি, সেগুলি চেম্বারস্ ডিকশনারি অথবা নেসফীল্ড-এর গ্রামার ইত্যাদি। এহেন বাবার সঙ্গে পিসিমার কথোপকথন আমার আজও কিছু কিছু মনে পড়ে। বাবাকে পিসিমা জিজ্ঞাসা করছেন, 'ব্রহ্মসংগীত পড় কি ? তোমাকে যে বলেছিলাম, রোজ দুটি করে ব্রহ্মসংগীত পড়তে ?' বাবা উত্তর দিতেন, 'হয়ে ওঠে না।' পিসিমা ধীরে ধীরে বলতেন 'ব্রহ্মসংগীত পড়বার সময় পাও না ?' ভাইকে শিবমোহিনী একাধিকবার ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে গেছেন, বিদ্যাসাগরের কাছেও নিয়ে গেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র শর্মার স্বাক্ষরযুক্ত *সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা* একখণ্ড দাশরথি দত্তর কাছে আমরণ ছিল।

শুনেছি, বাবা যখন ছাত্রাবস্থায় হুগলি কলেজে পড়তেন, তাঁর পড়বার খরচ নাকি শিবমোহিনী কিছুটা জুগিয়েছিলেন। শিবমোহিনী বিমাতার কাছে বাল্যেই কুলত্যাগিনী আখ্যা পেয়েছিলেন। বাড়ির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থাকবার কথা নয়। কিন্তু বহুদিন পরে নিজে নতুন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বয়সে অনেক ছোট এই বৈমাত্রেয় ভাইকে যে তিনি এতখানি আপন করে নিলেন, তা বুঝি শিবমোহিনীর মতো ব্যক্তিত্ব বলেই সম্ভব হল। আমার মনে পড়ে, স্নেহের বশে ভাই দাশরথিকে তিনি দাশু, দাস এমন-কী দাসী বলেও ডাকতেন। আমাদের বাড়িতে তিনি যখন থাকতেন, তাঁর রাতের খাবার দিতেন আমার মেজদিদি। খাবার দিলেই নাকি পিসিমা শুধোতেন, 'আমার দাসীর খাওয়া হয়েছে তো ?'

দাশরথির পরিবারে রক্ষণশীলতা বড় কম ছিল না। তার মধ্যেও শিবমোহিনী ঔদার্য এবং যুক্তিবোধের সঞ্চার ঘটিয়েছিলেন। শিবমোহিনী বাড়িতে উপস্থিত থাকলে তাঁর আয়োজিত দাস-দাসী ভোজনের দিনে বাড়ির কাজের লোকেদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের বসে খেতে হতো, কোনো ভেদাভেদ চলত না। শিবমোহিনী বলতেন, 'ব্রাহ্মসমাজে এসে জেনেছি স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে উপাসনা, আলোচনা, পরস্পর পরামর্শ দেওয়া-নেওয়া, এসবের কী ফল। আমাদের হিন্দুসমাজে এমনটি নেই।' আবার একবার আমার মা তারকেশ্বরে যাচ্ছেন, পিসিমা পুজো দিলেন। আত্মীয়দের সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে বললেন, 'কেন ? সমাজে যাঁকে উপাসনা করি, তিনিই তো তারকনাথ।' এসব গল্প মেজদির কাছে আমি শুনেছি।

মেজদিদির মুখে শুনেছি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের সঙ্গে নির্মলকুমারীর বিবাহে হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের আপত্তি ছিল। তিনি নাকি বলেছিলেন, দাঁড়িয়ে থেকে এ বিবাহ দেবেন না। তখন শিবমোহিনী এই বিবাহের উদ্যোগ নেন। বিবাহের আয়োজন কতদূর এগলো, সে বিবরণ শিবমোহিনী হেরম্বচন্দ্রকে দিতে গেলে, তিনি নাকি বিরক্তির সঙ্গে বলেছিলেন, 'আমাকে বলছেন কেন ? আপনার মেয়ের বিয়ে আপনি দিচ্ছেন, আপনি তো মেয়ের বাবা-মা উভয়েরই কাজ করছেন।' আমার মেজদিদি মুরলা বসু অনেকদিন ইহলোক

ছেড়ে গিয়েছেন। এই গল্পটির সত্যিমিথ্যা যাচাই করার উপায় আজ নেই। আমি যেমনটি শুনেছিলাম, তাই লিখলাম। তবে পরে প্রফুল্লচন্দ্র (বুলা) মহলানবীশের সঙ্গে কথাতেও আমি জেনেছি যে ওই বিবাহে শিবমোহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শুনেছি, ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের সঙ্গে শিবমোহিনীর যথেষ্ট যাতায়াত ছিল, সহজ সম্পর্ক ছিল। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আর প্রচারকদের কথা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।

আমাদের বাড়িতে যখন শিবমোহিনী থাকতেন, তাঁকে প্রার্থনামালা বা জীবনচরিত পড়ে শোনাতে হতো। এ বাড়ির মেয়েদের গানের চর্চা ছিল না। একটি বা দুটি ব্রহ্মসংগীত কবিতার মতোই পড়া হতো। মেয়েদের দিয়ে তিনি রান্না ও পথ্য তৈরির নির্দেশ লিখিয়ে খাতা করিয়েছিলেন; ঘরকন্না আর টোটকা চিকিৎসার খাতাও বানানো হয়েছিল।

১৯৩৮ সালে ছিয়াশি বছর বয়সে পৌত্র বিমলচন্দ্র সিংহের লক্ষ্ণৌর বাড়িতে শিবমোহিনীর দেহান্ত ঘটে। তাঁর নির্দেশমতো বিমলচন্দ্র শিবমোহিনীর মরদেহ বহু মানুষের সঙ্গে গঙ্গাতীরে নিয়ে গিয়ে দাহ করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের একটি ব্রহ্মসংগীত শিবমোহিনীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল :

> সংসারে নিযুক্ত থাক পদ্মপত্রে জলের মত।
> পরের সুখে সুখী হয়ে করে যাও জগতের হিত ॥

এ গানটি আক্ষরিক অর্থেই শিবমোহিনীর জীবনে সত্য হয়েছিল বলে আমরা জানি।

বারোমাস, শারদীয় ১৯৮৮

বৈধব্য-কাহিনী ১

গত দেড়শো বছর ধরে বাংলা সাহিত্যে বিধবা নিয়ে লেখার আর শেষ নেই। কোথাও নিছক ভক্তির উচ্ছ্বাস, কতক-বা তার সামাজিক ক্লেশ ও মর্যাদাহানির কথা, কোথাও সংসারে তার দেবীত্ব নয় দাসীত্ব, তার নিরাপত্তার অভাব আর আর্থিক দুর্গতি। এ ছাড়া তার সঙ্গে বিচিত্র আর জটিল অবৈধ সম্পর্ক ইত্যাদি সাত-সতেরো নিয়ে বহু উৎকৃষ্ট আর নিকৃষ্ট গল্প-উপন্যাস আমরা পড়েছি। গল্প-উপন্যাসেই পাওয়া যায় এমন বেশ কিছু জ্যান্ত চরিত্র কাছে থেকে প্রত্যক্ষ ক'রে ছোটবেলা থেকেই আমি বিধবাদের জীবনযাত্রার দিকে আকৃষ্ট হই।

কাশী বৃন্দাবন আর শান্তিপুর কাটোয়া নবদ্বীপে ঘুরে ঘুরে অনেক বিচিত্র জীবনকথা আর নানা উপকরণ সংগ্রহ করেছিলুম। চেষ্টা করেও ছাপাতে পারিনি। ক্রমে আগ্রহ কমে যায়, কাগজপত্রও হারাতে থাকে। তারপর পারিবারিক বিপর্যয়ে এখন সবই গেছে। তবু আজ শ্রী ইন্দ্রনাথ মজুমদারের (সুবর্ণরেখা) আগ্রহে কিছু টুকরো কাগজ আর বিনষ্টস্মৃতি ভরসা ক'রে কয়েকজনের দু'চারটি কথা জড়ো ক'রে দিলুম।

বাংলা সাহিত্যে শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিকবর্গের বিধবাকুলের প্রতি কি নিষ্ঠুর উদাসীনতা ছিল তা সে আমলের কিছু কবিতা এবং সেইসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের লেখা খুঁটিয়ে পড়লেই নজরে আসে। সেকালের জবরদস্ত নাট্যকার আর কবি রসরাজ অমৃতলালের লেখা থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে দিয়ে শুরু করছি :

পুরাণের কোন দেবী এত শক্তি ধরে
জ্যৈষ্ঠ মাসে একাদশী জল বিনা করে।
সমস্ত শরীর সুখে হেসে বলিদান
লজ্জায় পালায় কাম ফেলে ফুলবান।

এই কবিতার সঙ্গে দেওয়া টিপ্পনি থেকে জানা যাচ্ছে অমৃতলালের মা মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়েসে বিধবা হন, আর সেই মাসেই ক'দিন বাদে তাঁর কলেরা রোগ হয়।

সদ্যোবিধবার একাদশী ব্রতপালন আর শাস্ত্রমুগ্ধ পরিবার-পরিজনের বর্ণনা কবি এইভাবে দিয়েছেন :

নগরে নিদাঘ জ্যৈষ্ঠ দিবা দ্বিপ্রহর
বিসূচিকা তৃষা তাতে কত ভয়ঙ্কর
শক্তি বুঝিবারে বুঝি সদ্যো বিধবার
সেইদিন একাদশী পড়েছে আবার।

ভিষক আসিয়া গেল লিখিয়া ঔষধ
একে একাদশী তায় 'ডাক্তারের মদ'।
উড়িল ব্যবস্থাপত্র বাতাসে উঠানে,
কাকীমা জলের ফোঁটা দেন মার কানে।

পাথরে রাখিয়া জল উদরে বসায়
জননী জীবন পান ঈশ্বর কৃপায় ॥

পবিত্র প্রতিমা হেন নাহিক ধরায়
বঙ্গের বিধবা পাশে দেবী হেরে যায়।
ভেঙো না প্রতিমা চারু, মুছো না এ ছবি।
গলায় কাপড় দিয়ে পায়ে ধরে কবি ॥

—*অমৃত-মদিরা*। কবিতায় তারিখ নেই, বই ছাপানো হয় ১৩১০-এ (১৯০৩)[১]।

ইন্দুমতী

আমার মেজপিসিমা শিবকালীর ছোট জায়ের নাম ইন্দুমতী। এঁর জন্ম আন্দাজ ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে। ছোটখাটো জমিদার বংশে বাপের আদরের এই পরমাসুন্দরী মেয়ের বিয়ে হয় হুগলি জেলার বড়া গ্রামের বসু-মজুমদারের বংশে। তাঁদের ডাকাতির বদনাম ছিল। তাই প্রথমদিকে পিসিমার বাবার এই বিয়েতে আপত্তি ছিল। কিন্তু বিস্তর সম্পত্তি থাকায় শেষ পর্যন্ত তিনি রাজি হলেন। খুব ধুমধাম ক'রে বাদ্যি বাজনা বাজিয়ে এই বিয়ে হয়েছিল। ভাশুর খুব রাশভারী লোক ছিলেন, তাঁর দাপটও ছিল অসম্ভব। প্রথম স্ত্রী হাঁপানিতে বিস্তর ভুগে মারা যেতেই ভাশুর ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে লাগলেন। এক জায়গায় খুব সুন্দর মেয়ে দেখে এত পছন্দ হল যে ছেলের কথা ভুলে গিয়ে টপ্ ক'রে নিজেই বিয়ে ক'রে বসলেন।

তার কিছুকাল পরে পিসিমার সর্বনাশ ঘটল। বাপের বাড়িতে খবর যেতে কান্নাকাটির হাট বসে গেল। পিসিমা তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি। ডুরে কাপড়, গয়নাগাটি পরে খোঁপা বেঁধে বেড়াতেন, চুলে সোনার চিরুনি-ফুলকাঁটা সবই দিতেন। ক'মাস না যেতেই একদিন ঘোষেদের মেয়ে এসে বললে, 'তোর ভাতার মরেচে। ১২/১৪ বছরের ধাড়ি হলি, একাদশী করবি কবে ? মা তো খুব সোহাগিনী সাজিয়ে রেখেছে। সিঁদুর পরাবে কবে লো ?'

কথা শুনে পিসিমার গা কাঁপতে লাগল। ন্যাড়া ছাতে গিয়ে খুব কাঁদতে লাগলেন। সব গয়না ছেড়ে শাড়ির পাড় ছিঁড়ে ফেললেন! এই ঘটনায় তাঁর বাবা-মা সব বিস্তর কাঁদলেন। তিনি আরো বলেছিলেন, 'রোজ কাঁদতে না পেলে আমার খ্যাপামি বেড়ে যেত। একদিন কান্না মুছতে গিয়ে দেখি সব গয়না গিয়েও নাকে নোলক রয়ে গেছে। খুব ভারী ছিল সেটা। টেনে ছিঁড়তে পারিনি। রক্ত পড়ে কাপড় ভেসে যেতে লাগল। তারপর একদিন বাড়ির বিশু-নাপিত এসেছে ভায়েদের চুল কাটতে। তাকে দাদা বলেই ডাকি। তার কাছে গিয়ে গলা ধরে আবদার ক'রে বলি, "আমায় একটা ভিক্ষে দেবে ?" তাকে তিন সত্যি করিয়ে নিয়ে বললুম, "মাথাটা মুড়িয়ে দাও দাদা", বিশু বললে, "না ভাই, কত্তার হুকুম চাই"। বললুম, "কত্তার বাপের হুকুম পেয়েছি"।'

মাথা কামানোর পর তাই না দেখে বাবা-কাকারা জুতো নিয়ে বিশুকে মারতে গেলেন। পিসিমা বললেন, 'তোমরা এমন করলে ঝাঁপ খেয়ে মরব। নইলে গলায় দড়ি দোব। বিধবাকে পেড়ে কাপড় পরিয়ে ক'দিন রাখবে ?' পিসিমা বলেছিলেন, 'আমার বিচ্ছিরি চ্যাঁচানি, চোটপাট, ঝাঁঝালো পাকা কথা শুনে তাঁরা আবার মুখ ঢাকলেন। আমার বাবা ছিলেন অতি ভদ্র অতি শান্ত— বেশিদিন বাঁচেননি এই ঘটনার পরে।' পিসিমার জবানিতেই বলি :

মাথা মুড়োবার কিছু পরেই রোজ রোজ ঝগড়া ক'রে জেদের মাথায় শ্বশুরবাড়ি চলে যাই। সেখানে আমার ভাগে ছিল সম্পত্তির আট আনা অংশ। বড় বড় ঘর, খিলেন দেওয়া দালান, দেয়ালে দেয়ালে পঙ্খের কাজ, জাফরি দেওয়া ঢাকা বারান্দা, বৈঠকখানায় সারি সারি আলবোলা। শতরঞ্জি কার্পেট মোড়া মেঝে, দেয়ালে রাজা-রানী আর মেমসাহেবের ছবি। উঠোনে একটা পালকি আর ঘোড়ার গাড়ি পড়ে থাকত। ভাশুর ঘোড়াদুটো নিয়ে গেসলেন। মানুষই রইল না, তো আর ঘোড়া আর মেড়া।

ঘরে মস্ত উঁচু খাট, আলমারি, সিন্দুক, গয়না, খেলার পুতুল, রাধাকেষ্টর জ্বলজ্বলে ছবি সবই ছিল। ছিল না শুধু মানুষ— বিশেষ ক'রে আপন বলতে কেউ। সঙ্গী বলতে থাকত এ বাড়ির বামুনদিদি, আমার খাস ঝি মোক্ষদা,আর আমার ওপর সর্ব্বোক্ষণ নজর রাখার জন্যে আর একজন ঝি। পাশের বাড়িতে থাকত আমার সই। বাপের বাড়ির সঙ্গে কিছু একটা কুটুম্বিতে ছিল। সই-ই ছিল আমার মনের কথা বলবার ও বোঝবার মতো একমাত্র মানুষ।

সে-ই বলেছিল খাটে শুবিনি, শুলে নিন্দে হবে। অতবড় বাড়িতে কেউ কোথাও থাকত না, বড় ভয়-ভয় করত। বামুনদিদিকে নিয়ে সেই থেকে মেঝেতেই শুতুম। সারাদিনে কোনো কাজকম্মও থাকত না। প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠত।

মাসে একবার নায়েব মশাই আসতেন মুহুরি সঙ্গে নিয়ে। মোক্ষদাকে সামনে রেখে কথা হতো। দোতলায় অন্য বেটাছেলে তো দূরের কথা বাড়ির চাকরদেরও আসবার হুকুম ছিল না। নিজে কোথাও বেড়াতে যাবো তার হুকুমও বড় তরফের ভাশুরের ছিল না। পাড়ার গিন্নিরা বেড়াতে এসে গল্পগাছা করতেন। সেও হয় শাশুড়ি-ননদের কোঁদলের কথা না হয় যাচ্ছেতাই কেচ্ছা! মুখ বুঁজে শুনতে হতো। ভালোও লাগত না। পাড়ায় রটে গেল, 'তোমাদের ছোট বৌ দেখতেও খাসা, কতা কইতেও খাসা— এমন হলুদ পাখি খাঁচায় থাকলে হয়। মাথায় ঘোমটা যেন থাকেই না, জবাব উত্তরও পটাপট করে।' এদের ঘরে-ঘরের কেলেংকারির বেত্তান্ত নিত্যি শুনতে শুনতে প্রাণ অস্থির হয়ে পড়ত।

খাওয়া দাওয়া ভালোই ছিল। বড় পাথরে সরু চালের ভাত, ঘিয়ের ছিটে দেওয়া, কাঁচকলা মটর ডাল সেদ্দ, শেষ পাতে একটু ক্ষীর, কিন্তু সবেরই পরিমাণ এমনই কম থাকত যে খেয়ে পেটও ভরত না। কাকেই বা বলব, শেষে বলবে হ্যাংলা বৌ। একাদশী, অম্বুবাচী, দশুমী, দোয়াদশী, পারণ, বামুন খাওয়ানো— হাজার রকম উপোস তিরেস সবই থাকত ফি-মাসে। ঠাকুর মশাই ঘন্টা বাজাতে বাজাতে এসে মোক্ষদাকে হাঁক পেড়ে উপোসের কতা শুনিয়ে টাকা নিয়ে যেতেন। একাদশীর আগের দিন দশুমিতে ভাত খাওয়া চলত না, দোয়াদশীতে বামুন খাইয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে তবে চিনির পানা খাওয়া যেত।

বিধবা হলেই নাকি দীক্ষা নিতে হয়—নইলে তার হাতের জল শুদ্ধ হয় না, পাড়ায় নিন্দে রটে, বংশের বদনাম হয়। ভাশুরেরা ওঁদের কুলগুরুকে পাঠালেন। দেখেই কেমন ভক্তি চটে গেল। বড্ড বাবুয়ানা ঢঙ। আমার মন চাইল না ওঁর কাছে দীক্ষা নিতে। শুনে তো ভাশুর চটেই আগুন। আরো যাচ্ছেতাই কতা রটতে লাগল। অনেকেই অনেক রকম সন্দেহ করতেন, কিন্তু আমার অমন মতি ছিল না।

এরই মধ্যে আবার আমার নতুন বড় জা-কে তাঁর 'সাধে'র দিনে সকলে পেন্নাম করতে গেল। অষ্ট-অঙ্গে গয়না পরে আলতা পরা পা জলচৌকিতে তুলে তিনি পুতুলের মতো বসেছিলেন। ঝিয়েরা সব ঘিরে ছিল। আমাকে কেউ কিছু বলেননি, আর উনিও কোনো কতাটতা কইলেন না।

ভাশুরের বড় ছেলে নির্মলের বিয়ে আমিই খরচ ক'রে দিয়েছিলুম। নির্মলকে দিব্বি করিয়ে নিয়েছিলুম, ছেলের মতো সে আমার বিষয়-আশয় দেখবে। কিন্তু সে আমাকে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি লিখে দিতে বলেছিল। আমি রাজি হইনি। সইও বারণ করেছিল। আমার মাসোহারা ছিল শুনেছি ২৫০ টাকা। কিন্তু নায়েব মশাই হাতে দিতেন ৫০ টাকা। আর বলতেন কাছারিতে আপনার নামে খাতায় মাসে ২০০ টাকা জমা লেখা থাকছে।

সব দেখেশুনে মনে হতো পাগল হয়ে যাব। কেবল মনে হতো কোনো তীথে চলে যাই। ভাশুরও চাইতেন না আমি শ্বশুরবাড়িতে থাকি।

সই একদিন বললে, 'টাকা কি চিবিয়ে খাবি ? বয়েস থাকতে থাকতে কাশী বেন্দাবন কোনো তীথে চলে যা। ধম্মপথে থাকবি, দুঃখী যাকে যা খুশি হয় দিবি, যা খুশি করগে যা—এদের আওতায় থাকলে হাপ্‌সে মরবি।'

আমি একটু আদুরে আর মেজাজি ছিলুম। ওদের কতাবাত্তাও বড্ড বিচ্ছিরি ছিল। মনে হতো গাছতলায় থাকব, তবু এখানে নয়। তবে ঠিক কি কারণে কাশী চলে যাই তা আর বলে কি হবে। নোংরা ঘাঁটতে আমার পিবিত্তি নেই। এটা জেনো, নিজের বাপ মা স্বামী পুত্তুর না থাকলে জগতে মেয়েমানুষের কেউ থাকে না। ঘরের মানুষ সুজন হলে তবেই বিধবা সুখে থাকে, তা নইলে জ্যান্ত নরককুণ্ডু।

সব কিছু ভেবে তীথে যাওয়াই ঠিক করলুম। সই মারফত বাপের বাড়িতে খবর দিলুম। সবাই একজোট হয়ে কাশী পাঠানোই ঠিক করলেন। আমিও ভাবলুম কাশীতে গঙ্গা আছে, বাবা বিশ্বনাথ আছেন, মণিকর্ণিকার ঘাট আছে—মরলে তো ওখানেই যেতে পাবো !

কাশীতে ছিলেন তোমার ছোটকাকা—মানে আমার বড় জায়ের আপন ছোট-ভাই। সেই-ই বাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থা করলে। তাঁকে এঁরা টাকা-কড়ি পাঠিয়ে দিলেন আর বললেন মাসে মাসে ঠিক সময়েই মাসোহারা পাঠাবেন। নির্মলকে সম্পত্তি দেখার ভার দিলাম। গুচ্ছের সব খরচ খরচা বাদ দিয়ে তখনকার যুগে ১০০ টাকা মাসোহারা ঠিক হল। সই চোখের জল ফেলে বলেছিল, 'যা প্রাণ চায় বছর দু'য়েকের মধ্যেই করে নিবি। আস্তে আস্তে শেষকালে এরা তোকে কলা দেখাবে। এমন সবারই হয়।' বিশ্বাস হয়নি।

নায়েব মশাই চারশ' টাকা হাতে দিয়ে বলেছিলেন বাকিটা মনিঅর্ডার করবেন। গয়না-গাঁটি, বাসন, কোসন সবই ওদের সিন্দুকে রইল। কাঠের আলমারিতে বিস্তর কাচের পুতুল ছিল। একটা জটাজুটধারী শিবের মূর্তি চাইতে গিয়ে শুনলুম চাবি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওদের জিনিস চেয়ে দেখতেও আর সাধ হয়নি।

কাশীতে এসে ভালো একটা বারান্দাওলা ঘর নিয়ে গোড়ার দিকে বেশ আনন্দেই ছিলুম। নামকরা এক পাণ্ডাও যোগাড় হয়েছিল। এঁর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন তোমারই কাকা চন্দ্রশেখর। তাঁর তখন খুব রমরমা। চাঁদবাবুর নাম বললে এক ডাকে সবাই চিনত। সইয়ের কথা মনেই ছিল। ভালো কাজ যা করবার দু-এক বছরের ভেতরেই করতে হবে। পাণ্ডার মুখে শুনলুম বাবা কেদারনাথের মন্দিরে পাথর বসিয়ে সোয়ামি শ্বশুর বাপ ঠাকুরদার নাম লেখালে নাকি তাঁদের অক্ষয় স্বর্গবাস হয়। তাই বেশ খরচ করেই একে একে বামুন খাওয়ালুম, কুমারীপুজো করলুম, কেদারনাথকে সোনার বেলপাতা দিলুম আর মন্দিরের চৌকাঠ ঘেঁসে বাঁ হাতি এক শ্বেতপাথর বসিয়ে সোয়ামি, শ্বশুর, দাদাশ্বশুর, বাপ, মা, গাঁয়ের নাম সব লেখালুম। ওটাই আমার প্রথম আর শেষ ভালো কাজ।

তারপর ছ'মাস যেতে না যেতে মাসোহারা কমতে লাগল ; কেবলই নাকি মামলা বাধে, খাজনা বাকি পড়ে। শেষে এখানে আমারও ঘরভাড়া বাকি পড়ল। মাসোহারা কমতে কমতে ১০০ টাকা থেকে শেষ অব্দি দশটাকায় এসে ঠেকল। বড় ঘর ছেড়ে দিয়ে একটাকা ভাড়ার ঘরে এসে উঠলুম। সইয়ের কতা গণক্কারের মতো ফলে গেল। সে যেন আমার অদৃষ্টের সবটাই আগাম থাকতে দেখতে পেয়েছিল। খুব বুদ্ধিধারী আর উব্‌গারি ছিল সে। জন্মে জন্মে যেন এমন সই পাই।

তারপর কত ঘুরেছি, দেখেছি, লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। সব বিধবারই একই ধারা, একই কষ্ট।

গোড়ার দিকে কি বিচার ছিল আমার—চব্বিশ ঘণ্টা তসর কাপড় পরে ভালো কমণ্ডলু হাতে ঘুরতুম গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরে। তোর কাকার বড় মেয়ের বিয়ে হল শ'বাজারের রাজবাড়ির ভাগ্নের সঙ্গে। কী কেত্তন, কী পত্তন—তাও আমি খেলুম না, নানারকম ছোঁওয়া পড়বে হালুইকরের রান্নার। সেই আমি এখন যেদিন জোটে না ছত্রের ভাত খাই। যে ডাকে তার বাড়িতেই যাই।

তবু কাশীবাসের সুবিধে কি জানিস—যত দুঃখ, যত অভাব ঘরে থাকুক, গঙ্গার ঘাটে এসে দাঁড়ালে সব ধুয়ে যেত। গোড়ার দিকে টাকা কমে যেতে চোখে অন্ধকার দেখতুম। একদিন এক সাধুবাবা বললেন, 'মা, সারাদিন ঘাটে ঘাটে ঘুরে পুজো করলে দিন কেটে যাবে'খন ; ছেলেপুলে ঘরসংসারের বালাই যখন নেই তখন চলে যাবে।'

বারোমাস কেদারঘাট থেকে ডুব দিয়ে আধপয়সার বেলপাতা কিনে কৌটোয় আলোচাল নিযে ঘাটে ঘাটে হেঁটে হেঁটে শিবপুজো করতুম— মণিকর্ণিকায় পৌঁছতে ঘেমে নেয়ে যেতুম, আবার একটা ডুব দিয়ে সঙ্কটার ঘাট থেকে ভিজে কাপড় পুঁটুলি ক'রে ফিরে আসতুম। বাড়ি ফিরে যা খেতুম তাই যেন অমর্ত। কথায় বলে খিদের টাকনা দিয়ে খাওয়া।

কাশীতে বড়মানুষের বৌ এলে অনেকেই আমায় সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর দেখত। কারো মন চাইলে কিছু বা দিত, তবে আমি কখনো চাইনি। এদানি আর দিন চলতে চাইত না, কিন্তু ঐরকম থেকে থেকেই কেদার-বদরি করেছি। লছমনঝোলা পুল হয়নি তখনো, লোহার ওপর দিয়ে মাথায় দড়ি ধরে ধরে পার হয়েছি। কুড়ি-পঁচিশজন জুটলেই আমরা বেড়িয়ে পড়তুম।

কাশীর হেন ঠাকুর নেই যে দেখিনি, হেন সাধু নেই যার পায়ে মাথা খুঁড়িনি। কত হরিসভা, কত কথকতা, রামায়ণ গান শুনতে শুনতে সন্দে নেমে যেত। কেউ কিছু দিতে পারে না মা, তবু ভয়ে ভক্তিতে ঐ ভাবেই চলে আসে চিরকাল।

আজমীর পুষ্কর করেছি বইকি, তবে সাবিত্রী পাহাড়ে উঠতে পারিনি। সবাই বলত সাবিত্রীকে শাঁখা পরালে আসছে জন্মে আর বিধবা হয় না—এ নাকি বেদের কথা। তাই-ই সই, কুড়িয়ে বাড়িয়ে রাঙাচেলির কাপড় কিনি, সোনা দিয়ে শাঁখা বাঁধিয়েই রুপোর সিঁদুর কোটো, কাজললতা, পাতা-আলতা সব গুছিয়ে নিলুম।

বাঙালিটোলার সুবাসিনীদিদি, হাড়ারবাগের সিধুদিদি, মদনপুরার বিন্দুদিদি এরা আমার বহুকেলে বন্ধু। পাণ্ডার সঙ্গে আমরা আজমীর যাত্রা করলুম। বিস্তর ঘোরার পর আগের দিন ধর্মশালায় এসে যেই পুঁটুলি নাবালুম অমনি শরীর খারাপ হল। জনে জনে বললুম ভাই, দু'টো দলে যাও, আমি চান ক'রে শেষ দলে যাবো। কে শোনে কার কতা, সবাই আমায় ফেলে নাচতে নাচতে চলে গেল। ওরাই পোঁটলা খুলে পুজোর জিনিস বের ক'রে নিয়ে গেল। কম্বলে শুয়ে আমি পড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম।

আসার আগে কত সাধুসন্নিসির পায়ে পড়ি, 'বাবা, আমার যেন দর্শন পুজো হয়।' সব্বাই বলেছিল, 'যাও মা, ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো।' ঠাকুর দেবতা সাধু বোষ্টম বৈরাগী কারো কতা ফলে না গো, কপালটাই ফলে শুধু। ভগবানও পারে না কপাল খণ্ডাতে। শুধু লাঠি ধরতে পারে বিধবার একচুল এদিক ওদিক হলে। সিঁদুর নোয়া যেদিন যায় সেদিন থেকে শরীরের যদি রক্ত বন্ধ হতো তবে বুঝতুম। কাঁদতে কাঁদতে বললুম, 'ঠাকুর, লোকের মালা, চন্দন, গয়না, কাপড়, নিয়ে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকো শুধু, কাঠিটি নাড়তে পার না। আমার খিদে তেষ্টা আর এই রক্তভাঙা রোগ— এই তোমায় দিলুম।' বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল এমন পাপের কথা বললুম, যদি জিভ আড়ষ্ট হয়ে যায়— কি মুখ বেঁকে যায়! যদি হাত পা পড়ে যায়! ছি ছি, হাজার হোক ঠাকুর— এমন কথা কি বলতে আছে! বার বার নাক কান মুলে কাঁদতে কাঁদতে ফের ঘুমিয়ে পড়লুম। ঘুম থেকে উঠে কেন জানিনে ভয়ডর অনেকটা কেটে গেল।

বেলেঘাটায় আমাদের বাড়িতে পিসিমা যখন আসতেন, বছরের পর বছর একটু একটু ক'রে তাঁর কাছে নানা কথা শুনেছি। আট ভাশুরপো মিলে পিসিমার জমিদারি লাটে তুলে দিলে কি হবে তাঁর শরীর মন কেউ ভাঙতে পারেনি। উপরন্তু রামায়ণ আর পুরাণ শুনে শুনে তাঁর মুখস্থ ছিল সমস্ত প্রাচীন কাহিনী। সত্যিই প্রয়োজনে বিধান দিতেন, কর্তব্য বাতলে দিতেন মাথাওয়ালা মানুষদেরও। সবাই বলত 'বিধান পিসিমা'। এ-ছাড়াও ওষুধ বিষুধ, রান্নাবান্না, কুটনো বাটনা কাজেকর্মেও তাঁর জুড়ি ছিল না। পাণ্ডা, পুলিশ, উকিল, জ্যোতিষী, পুরুত সব চিনতেন।

নতুন চাকরি পেয়ে কলেজের কাজ, যাতায়াত, সব মিলে পিসিমার কথা আমি ভুলে গেলুম। শেষ দেখা ১৯৫৫ সালে। কলেজের দুই বন্ধুকে নিয়ে এলাহাবাদ হয়ে কাশী এলুম। শুনলুম পাড়ার পাঁচজনে মিলে মিশনের সেবাশ্রমে পিসিমাকে ভর্তি ক'রে দিয়েছেন। বিধবা ওয়ার্ডের নানা ভিরকুট্টি, দু'দিন গিয়ে দেখাই হল না। শেষ দিনে অধ্যাপিকা কমলা দাশগুপ্তার সঙ্গে গিয়ে পৌনে একঘণ্টা খুঁজে তবে দেখা পেলুম। আমি তো চিনতেই পারিনি। আট আনির ছোট তরফের জমিদারনি আমাদের বিধান পিসিমা একটা জানলাহীন অন্ধকার ঘরে দিন-দুপুরে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে বসে 'মুখপোড়া ভগবান'কে গালমন্দ করছেন। চোখেও তেমন দেখেন না।

তখন আমি বেগতিক দেখে নিজের নাম, বাবার নাম বলে বিস্তর চেঁচাতে তবে

তাঁর জ্ঞানগম্যি হল। চেনবার সঙ্গে সঙ্গে হু-হু ক'রে কেঁদে উঠলেন। কতক্ষণ পরে, কতদিন কাশী এসেছি শুধোলেন, কুড়িদিন এসে যাবার আগে দেখা করতে এসেছি শুনে আবার কান্না। বললেন, 'আমি কোথায় ভাবছি তোর কাছে দু'দিন থাকব, পা ছড়িয়ে কাঁদব, তা না এই ব্যাগারঠালা কুটুম্বিতে। যা, তোর মুখ দেখতে চাইনে'— বলে মুখ ঘুরিয়ে বসলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, 'কি এনেছিস আমার জন্যে দেখি!' কিছুই নিয়ে যাইনি। কমলাদির কাছে ঠাকুর মন্দিরের প্রসাদী প্যাঁড়া দু'টুকরো ছিল, তাই খেয়ে বললেন, 'এইটুকু! অমন মায়ের এই মেয়ে! সন্দেশ না পেলি বাতাসা কি এলাচদানা আনলিনি কেন? একটা খালি কোটো দিবি রে? দু'টো চালভাজা খেতে বড় ইচ্ছে করে। ঐদিকে ওরা পায়। ওরা মাসে মাসে টাকা দেয় কিনা। আমার মতো পথে-বসা আরো দুচারজন এদিকে আছে, তারা সকাল বিকেলে একবাটি ক'রে শুধু চা পায়'— বলে কলাইয়ের গেলাস, থালা সব দেখালেন। আগের দিনে উনি কলাইয়ের বাসন হাতেও ছুঁতেন না। কাপড় পড়েননি কেন জিগ্যেস করতে বললেন, 'চব্বিশ ঘণ্টা পরে থাকলে ছিঁড়ে যাবে যে। দু'খানা তো মোটে পাই বছরে, বিকেলে যখন চা দিতে আসে তখন একবার গায়ে জড়াই। ওমা, একখানা ছেঁড়া গামছাও আনিসনি রে!'

সত্যিই কিছু নিয়ে যাইনি সঙ্গে; বেড়ানোর নেশায় এমনই উন্মত্ত ছিলুম। আসবার সময় বললেন, 'ঠাকুর দেবতা তো সবাই দেখে বেড়ায়, তা তুইও সেই দলে গেলি? গরীব দুঃখীর কথা ভাববার আর সময় পাসনে?'

কলকাতায় ফিরে কবে যেন খবর পেলুম পিসিমা আর নেই।

ডঃ বনবিহারী মুখুজ্যে কোথায় যেন লিখেছিলেন— ঘরের বিধবা মাসিপিসিকে আমরা ফেলে দিইনে। মুখে একটা আব কি আঁচিল থাকলে যেমন ফেলা যায় না, ঠিক সেইভাবে তাদের আমরা সহ্য ক'রে যাই।

জ্ঞানদাসুন্দরী

বড়মাসিমাকে প্রথম দেখি আন্দাজ ১৯৬৫-তে। মাস্টার মশায়ের বাড়ি কালীঘাটে খুব যেতুম। তাঁর মেয়েদের বড়মাসিমা, আমিও তাঁই বলতে লাগলুম। লম্বা ফর্সা একহারা চেহারা, মাথায় কদমছাঁট কালোচুল। তখনই তাঁর বয়স আশির অনেক উপরে, চেহারা দেখলে তা একটুও বোঝা যেত না। প্রচণ্ড রকমের শক্তসমর্থ। রান্না কুটনো থেকে সিঁড়ি ভেঙে ক্রমাগত দোতলা তিনতলা করা, কোনো-কিছুতেই ক্লান্তি নেই। সাড়ে এগারো বছর বয়সে তিনি বিধবা হন শুনে আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করি, তারপর ক্রমশ তাঁর সঙ্গে আমার স্নেহের সম্বন্ধ রীতিমতো পাকাপাকি হয়ে গেল।

বাড়ির লোকের মুখে শুনলুম উনি অত্যন্ত কর্মিষ্ঠা। দুর্গাপুজোর ভোগ রাঁধতে এ-বাড়ি এসেছেন। এই বয়েসেও চল্লিশ-পঞ্চাশজনের উপযুক্ত তরকারি চাটনি পায়েস এসব রাঁধতে পারেন। কোথাও কাজকর্ম থাকলে সে সব বাড়িতে ওঁর ডাক পড়ে ইত্যাদি।

আমিও যতটুকু দেখতুম তাতে উনি সর্বদা হয় বড়ি দিতেন, নইলে রাশি রাশি কুটনো, নয় তেঁতুল কাটতেন। গুণ-ছুঁচ হাতে ভাঙা কুলো-ডালা-হাতপাখা মেরামত করতেন। সর্বদা উবু হয়ে বসতেন। খালি গায়ে, শীতের দিনেও একখানি মোটা থান পরে থাকতেন। চাদর নিতেও দেখিনি। জামা পরতেও নয়। চাদর নেবার কথা বলতে বলেন, 'বিধবার অত শীত করে না।' কোনো জামা নাকি উনি গায়ে দেননি বিধবা হবার পর থেকে। এইসব কথা শুনে আমার খুব কৌতূহল বেড়ে যায়। বছরে দু-একবার ওঁর সঙ্গে দেখা হলেও আমি খুব চেষ্টা আর দীর্ঘদিন সাধ্যসাধনা ক'রে ওঁর মুখ থেকে যে-সব কথা জেনে নিই, তা যতদূর পারলুম অবিকল বলে যাচ্ছি তাঁর জবানিতেই:

স্বামীর কথা মনে কি ক'রে থাকবে মা ? মোটে দু তিনবার হয়ত দেখে থাকব। আমার বিয়ের ক'মাস পরে একদিন বাপ কি খুড়ো কার কাছে খুব বকুনি খেয়ে উনি মাথা গরম ক'রে গলায় দড়ি দেন। আমি যখন শুনলুম তখন কিছুই বুঝিনি। বিধবা কাকে বলে তাই জানতুম না। আমাদের বাড়িতেও তো কেউ বিধবা ছিল না। পাড় দেওয়া কাপড়, ডুরে শাড়ি তাও পরেছি—বাপের বাড়ি কিনা। খাবার সময় মাছ চাইলে মা কাঁদতেন। তাই চাইতুম না। মাছ যে কেমন খেতে তা আজ আর মনেও পড়ে না।

বাবা যেমন নিজে জপ আহ্নিক করতেন তেমনি যত্ন ক'রে আমাকে একাদশী ব্রত নেওয়ালেন। তখনো হাতে দু'গাছা ক'রে চওড়া চুড়ি আর গলায় হার ছিল। আমার মায়ের ছেলে হতো আর মরে যেত। আমিই তাদের নাড়াচাড়া করতুম। পাড়ার লোকের ছেলে হলেও আমি তাল সামলাতে গেছি। না,—আমার কোনোদিনও নিজের ছেলে নেই বলে দুঃখ হয়নি। আমি যে বিধবা ! ছিঃ, ওসব কথা কি মনে আনতে আছে ? বাবা বলে দিয়েছিলেন—'দুনিয়ার সব মানুষই তোমার ছেলে।' আমিও তাই জানতুম। আমার মায়ের কোল-পোঁছা শেষ মেয়ে হল গিয়ে তোমাদের মা। ও জন্মাবার পরেই নদীর জলে সবাই মিলে কুলোয় ক'রে ভাসিয়ে দিতে ধাইমা ধরে নিলে—তাইতে ও বাঁচলে। ওর নাম রাখা হল ভাসানী।

যখন আমার চোদ্দ-পনের বছর বয়স, পাড়ার লোক এসে মাকে বললে, 'ওগো, বাড়ন্ত মেয়েকে কেন আর সাজিয়ে গুজিয়ে রাখবে। আর আদর দিও না। শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দাও, ঘর করতে করতে চুপসে যাবে। বিধবার অত গোলগাল গড়ন ভালো নয়।' তারপর চুড়ি হার সব খুলে নেওয়া হল।

শ্বশুরবাড়ি যেতেই তক্ষুনি কুলগুরু ডাকিয়ে দীক্ষা দেওয়া হল। হাতের জল শুদ্ধ না হলে হেঁসেলে পাঠানো চলবে না কিনা ! গুরু বলে দিলেন ছাড়া কাপড়ে ইষ্টমন্ত্র জপ ক'রে তবেই জল খাবে। এদিকে মস্ত সংসারে কাজের ঠেলায় স্নান ক'রে উঠেই রান্নাঘরে যেতুম। সেখানকার পাট চুকিয়ে বেরুতে বেরুতে বেলা পড়ে আসত। ঘরভর্তি রান্না—ভাত তরকারির গন্ধে আমার খিদে যা পেত তা বলার নয়। এক একবার মনে হতো কিছু মুখে দিই। আবার খুড়শাশুড়ি বলেছিলেন অমুকের বৌ হেঁসেলে চুরি ক'রে

খেত বলে তার চোখ কানা হয়ে যায়। সেইসব পাঁচ কথা শুনে পেটের খিদে সামলে রাখতুম। মা-কালীকে কেঁদে কেঁদে রোজ বলতুম—আমার লোভ কমিয়ে দাও। তা মা-কালীর দয়ায় একটু একটু ক'রে খিদে যেন কমেই গেল।

জলখাবার কি আবার খাব ? আমাদের দেশে আটাময়দার চল ছিল না। দু'দশদিনে কখনো বা গুড়ছোলা কি বিচে কলা দু'টো একটা খেয়েছি। গরম ভাজাভুজি বিধবাকে কে দেবে বল ? তোরা যে সব সিঙেড়া নিমকি খাস ওসব আমি খাইনি, ভাজা মিষ্টিও আমাদের খাওয়া চলত না। সন্দেশ আর রসগোল্লাই বিধবাদের মিষ্টি। রসগোল্লা বড় শক্ত ঢিলের মতো, সন্দেশই মধ্যে মধ্যে খেয়েছি। কাজের বাড়ি মেঠাই হতো বটে, কিন্তু সে সব ছোঁওয়া-নেপা মাখামাখি। তাই বোঁদে-দরবেশ-পান্তুয়া আমাদের চলেনি।

আমার শ্বশুরবাড়িতে বিচারের খুব কড়াকড়ি ছিল। বিধবা মশুর ডাল হাতেও ছুঁত না, আর কড়াইয়ের ডালও চলত না। এখন আবার ঐ বাড়িতেই দেখি বিধবারা সবই খাচ্ছে। তরি-তরকারির মধ্যে অনেক বারণ ছিল। পুঁইশাক ছাড়া সব শাকও চলত না। ফুলকপি বীট গাজর বিলিতি বেগুন আর শীতের আদ্দেক তরকারিই তো বিলিতি বলে অচল, তবে আলু ওল কচু খেয়েছি। খেসারির ডালই সর্বদা খেতুম, মুগের ডাল মাঝে মাঝে। চিঁড়ে, মুড়ি, খই সবই তো লক্ষ্মীদ্রব্য ; তা যখন-তখন খেলে তো ভাত খাওয়া হয়ে যাবে, তাই খেতে হলে সেই ভাতের পাতে। আটা কোনোদিন জুটলেও ভাতের পাতে ছাড়া খেতে বারণ ছিল। হ্যাঁ, চালকুমড়ো খেতে খুব ভালোবাসতুম। আমাদের রান্নাঘরের চালে মস্ত একটা কুমড়ো ফলেছিল। তার দিকে একদিন চেয়ে আছি দেখে খুড়িমা বললেন—'চেয়ে দেখছ কি গো, ওটি ফলেছে আঁশঘরের চালায়। হবিষ্যি ঘরের মাথায় হলেও বা তুমি খেতে !'

ডালভাত কচুবাটা একটা তরকারি দিয়েই আমি থালাভর্তি ভাত খেয়ে ফেলতুম। একটু শাক-ডাঁটা থোড়-মোচা কাঁঠাল বীচি কি বড়ি থাকলে যেন হাতে স্বর্গ পেতুম। আমার শরীর বেশ ভালোই ছিল—একবেলা পেটভরে খেয়ে। রাতে বিধবাকে সামান্য রকম খেতে হয় তা জানো তো ? সাবু ছোলা গুড় কখনো ঘরে থাকলে কলা, আখ, শশা বা পেয়ারা—এসবও দু'চার কুচি। গরমের সময় আম কাঁঠাল আর বর্ষাকালে তালের মাড়ি খুব খেয়েছি। দেশের আম কিন্তু কলকাতার মতো নয়। তাতে বড্ড পোকা থাকত। অম্বল খেতে খুব ভালোবাসতুম। তেঁতুল, কুল, চালতা, আমড়া—এইসব খেয়েছি। মেওয়া ফল বিধবাকে খেতে নেই। বিলিতি খেজুরও তাই খাইনি। মুড়ি খই এসব ধামা ধামা ভেজেছি। খাবার সময় পাইনি। খিদে এত বেশি ছিল মা, যে নুনভাত পেলেই চলে যেত।

শীতকালে এক-একদিন বড়ি দিয়েছি টানা চার ঘণ্টা ধরে—পিঠের চামড়া যেন পুড়ে যেত। সে বড়ি টিনে টিনে পোরা থাকত। ভাঙা বড়িই আমরা ঝোলে খেয়েছি। দু'খানা মোটা কাপড় আর দু'টো বড় গামছায় বছর চলে যেত একটু কষ্ট ক'রে। তিনখানা হলে ভালো হতো। তা বলব কাকে ?

আমার খুব চুলের মাথা ছিল। মধ্যে মধ্যেই চুল কাটাতে হতো। চুল কাটা হলে গায়ে মাথায় খোল ঘসে চান করতুম। না, সাবান আমি ছুঁতুম না, ওতে গরুর চর্বি থাকে কিনা! আমার কাপড়ও আমি ক্ষারেই কাচতুম। এখন সাবান ছুঁই বটে তবে গায়ে দিইনে। না মা,—জামা কি জুতো আমি জন্মেও পরিনি। ওসব কথা ভাবলেও পাপ। গেল-জন্মে কত অত্যাচার অনাচাব ক'রে সেই পাপে আজন্ম বিধবা, আবার আগু বাড়িয়ে অন্যায় ক'রে নিজের মরণ ডেকে আনব?

একবার মাসিমাকে একটি গামছা দিতে তিনি এত খুশি হয়েছিলেন যে দেখে আমার চোখে জল আসে আর কি! সত্যিই আমি কষ্ট পেয়েছিলুম। এগারো বছর বয়েসে বিধবা হয়ে পঁচানব্বুই বছর তিনি বেঁচেছিলেন। ও-বাড়িতে গিয়ে অষ্টমী পুজোর মধ্যে শুনলুম মেয়েরা বলাবলি করছে, 'শুনেছিস, বড়মাসিমা মারা গেছে। কী আশ্চর্য বাপু, আমি ভাবতুম ও চিবজীবী হবে। আধপেটা খেয়ে এতদিন বাঁচল, পুরো খেলে দু'শো বছর বাঁচত বোধহয়।' ওদেব বাড়িতে ঐ সময় বলির বাজনা বাজছিল। তারপবই ভোগের পাত পাড়ার হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। তাই বাকিটা শুনতে পাইনি।

বড় ছোঁয়াছুঁয়ি বিচার করতেন বলে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেও আমি ভয় পেতুম। কী জানি তাঁকে হয়ত কাপড় কাচতে হবে। তাঁর কিছু চাই কিনা জিগ্যেস করায় একদিন খানিকটা শনের দড়ি চেয়েছিলেন। সম্ভবত মেরামতির জন্যে। ঐ এক বান্ডিল দড়ির দাম ছিল পাঁচ আনা। রাঁধাবাড়ার বাইরে অন্য জগৎ সম্পর্কে তাঁর কোনো কৌতূহল দেখিনি।

আজ এতকাল বাদে মনে হয় বড়মাসিমার মন বলে পদার্থটির বহুদিন মৃত্যু ঘটেছিল। কখনো তাঁর মুখে নিজের দেশের গাছপালা পাখি নদী পুকুরের কথা শুনিনি। অগুনতি ছেলেপুলেকে মানুষ করেছিলেন। পাখির ছানার মতো তারা বড় হযেই তাঁকে ছেড়ে যায়। ইদানিং কোনো ছেলেপুলেকে কাছে ঘেঁষতে দেখিনি। আর্থিক অবস্থা নিয়ে কোনো দুঃখ কখনো করেননি। কোনো জিনিসপত্তর জামাকাপড় খাবার দাবার কিছুই দোকান থেকে কখনো কেনেননি। নিজের ভাগ্যকে কী প্রচণ্ড বিচারহীনতার সঙ্গে নিঃশব্দে মেনে নিয়েছিলেন বলে বোঝানো গেল না। কোনো তীর্থে কখনো গিয়েছিলেন কি? ঐ সময় আমি খুব বেড়াতুম। উত্তর দক্ষিণ আর পশ্চিমভারত বেড়িয়ে প্রতি বছরই ও-বাড়ি গেছি। কখনো বেড়ানোর গল্প শুনতে চাননি—অথচ ছুটে ছুটে মুড়ি-নারকোল এনেছেন বাটিভরে। বিধবাকে খেতে নেই, ছুঁতে নেই, দেখতে নেই, এই ছিল প্রতি মুহূর্তের বুলি। বিদ্রোহ না করুন প্রশ্ন করবার সাহস দূরের কথা, ইচ্ছে পর্যন্ত ছিল না। এমন নিরুদ্বেগ, এমন অনুত্তাপ ভাব মানুষের মধ্যে কমই দেখেছি।

বিধবার মাছ খাওয়া

বাসন্তী দেবী কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুচরিতা রায়ের মুখে নিচের ঘটনাটি শোনা। সুচরিতার মা সুরবালা দেবী তাঁর মা উত্তমাসুন্দরীর মুখে তাঁর বিধবা ননদের মাছ খাওয়ার এই অপূর্ব কাহিনী শোনেন :

উত্তমা দেবীর ননদ নিতান্ত কচি বয়েসের বিধবা। প্রথমটা হয়ত শুধুই দুধমিষ্টি খেয়ে থাকবেন, পরে বড় হয়ে পেট ভরে ভাত খাবার যখন বয়েস হল (আন্দাজ ছয় কি সাত) তখন খাবার ঘরের এক কোণে পিঁড়ে পেতে তাঁর মা যত্ন ক'রে মেয়েকে রোজ খাইয়ে দিতেন। সেই ঘরেরই অন্যদিকে বাড়ির ছেলেরা বসে মাছ-ভাত খেত। ছেলেরা একদিন বললে, 'তোর মাছ নেই ?' মা ডালের বড়া দেখিয়ে মেয়েকে বললেন, 'এইটে তোমার মাছ।'

দুষ্টু ছেলেরা মাছের কাঁটা চুষে মেয়েটিকে দেখিয়ে বলত, 'তোর মাছে কাঁটা নেই।' মেয়ে প্রায়ই বলত, 'আমার কেন কাঁটা নেই, মা ?' একদিন মা বললেন, 'কাল থেকে তোমাকে কাঁটাওয়ালা মাছ দোব।'

বলার পরে খাবারের চাঙারি ভেঙে বাঁশের চাঁচ নিয়ে সরু সরু কাঠি তৈরি ক'রে ডালের লম্বাটে বড়ায় ভরে দিলেন। মেয়ে খেতে খেতে ছেলেদের নিজের মাছের কাঁটা দেখিয়ে আহ্লাদ করত। সম্ভবত ব্যাপারটি গোপন থাকায় ছেলেরা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারেনি। এই ছলনা বেশ কিছুদিন চলার পর মেয়ে একদিন সব বুঝতে পারে।

নিজের বৃদ্ধ বয়েসে এই দিদিমা সুরবালাকে গল্পটি বলেছিলেন। সবাইকার বয়েস হিসেব ক'রে দেখা যাচ্ছে এ ঘটনা আন্দাজ ১৮৮০ সালের—দু'পাঁচ বছর এদিক-ওদিক হওয়াও সম্ভব।

একাদশীর বলি

এই কাহিনীটি দিয়েছিলেন বাসন্তী দেবী কলেজের অধ্যাপিকা সুমিতা মিত্র :

আমার মা গোলাপবাসিনী দেবী বিয়ের পরে আমার বাবা প্রফুল্লচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে তাঁর কর্মস্থলে গিয়ে প্রতিবেশী কোনো মহিলার মুখে এই ঘটনাটি শোনেন। এই মহিলা ছিলেন নিঃসন্তান বালবিধবা। বিধবার ব্রত পালন একাদশী অম্বুবাচী ইত্যাদির সার্থকতা কি, আর কতদূর— এইরকম আলোচনা মেয়েদের মধ্যে শোনার পর কোনো সময় একদিন মাকে তাঁর কাহিনী সব খুলে বলেন। ইনি চোদ্দবছর বয়সে বিধবা হয়ে গর্ভিণী অবস্থায় বাপের বাড়ি চলে আসেন। বাপ-মা মেয়েকে আদর যত্নে রাখলেও তার আচরণগত সমস্ত ব্যাপারে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ছিলেন। যেমন, বারোমাস বাড়ির পুকুরে মেয়ে স্নান করলেও একাদশীর দিনে কিছুতেই তাকে পুকুরে যেতে দিতেন না। দু'বেলাই

বাড়িতে তোলাজলে তাঁর স্নান ও গা-ধোওয়া সারতে হতো। ভয় ছিল যদি মেয়ে পুকুরে গিয়ে গোপনে জল খায় তবে ব্রতভঙ্গ, নরকবাস ইত্যাদি ঘটবে। মেয়ের স্নানের সময়ও ঝি সেদিকে নজর রাখত। যাই হোক, এভাবে প্রতি মাসের দুটি একাদশীতে সে একফোঁটাও জল পায়নি। অদৃষ্টের পরিহাসে গ্রীষ্মের একাদশীর রাত্রেই তার প্রসববেদনা ওঠে, আর তখন সে জলের জন্যে ছটফট করতে থাকে। বারবার জল চাইলেও আগামী জন্মে মেয়ের বৈধব্য আশঙ্কা ক'রে মা জল দিতে পারেননি। ছেলের মুখ দেখলে সব খিদে-তেষ্টা ভুলে যাবে এমন সান্ত্বনাও মেয়েকে দিয়েছিলেন। দ্বাদশীর সকালে মেয়েটি একটি মৃত পুত্র-সন্তান প্রসব করে।

মা বেঁচে থাকলে ঐ মেয়ের নামধাম এবং তার পরিচয় ও গ্রামের নাম সবই তোমায় দিতে পারতেন, কারণ ঘটনাটির বেদনা মা জীবনেও ভুলতে পারেননি। মায়ের তখনকার বয়েস আর ঐ বিধবা মেয়েটির হিসেব ধরে বলা যায় যে এ ঘটনা ১৮৯০ সালের হওয়া সম্ভব।

এক সূর্যে ভাত খাওয়া

রাজশাহির কমলা রায় এখন বরানগরের বাসিন্দা। তাঁর কাছ থেকে এটি পাওয়া :

বিধবাদের দুঃখের কাহিনী আমিও অনেক জানি, তবে আজ তোমাকে আমার মায়ের মুখে শোনা কথাই বলি। বাংলা ১৩০০ সালে ন'বছর বয়েস পূর্ণ হবার আগেই আমার মায়ের বিয়ে হয়। ঐ দিন ঐ লগ্নে বাড়িতে মায়ের পিসিরও বিয়ে হল। এই পিসিমা ছিলেন মায়ের খুব বন্ধু আর তাঁর বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। বিয়ের ছ'মাস না যেতেই পিসি বিধবা হলেন।

কিছুকাল বাপ-মা মেয়েকে আইবুড়ো সাজিয়ে রাখলেও বয়স হতেই সব জানার পর গয়নাগাটি খুলে থান কাপড় পরে ইনি আচার বিচারের প্রচণ্ড বাড়াবাড়ি ক'রে নিজের মা-বাবাকে খুব কষ্ট দেন। শৈশবে এই ঘটনার সাক্ষী থাকায় মায়ের বহু সংস্কার কেটে যায়, বিশেষত পাঁজিপুঁথি দিনক্ষণ একেবারেই মানতেন না।

মায়ের নিজের চোখে দেখা আর এক বিধবার কথা শোনো। সেনহাটি খুলনায় মায়ের বাপের বাড়ি। এটি সে দেশের।

এই মেয়েটির বিয়ে হয় চার বছর বয়েসে। বছর না ঘুরতেই মেয়ে বিধবা হয়। তাকে বাঁচিয়ে রাখতে মেয়ের মা বারেবারে দুধ খাওয়াতেন, কিন্তু তাতে তার পেট ভরতো না। স্বাস্থ্য ভালো থাকায় সে খেতও বেশি। খুলনার গাঁয়ে আটা ময়দার চল ছিল না। খাওয়া বলতে শুধুই ভাত। এদিকে এক সূর্যে বিধবাকে দু'ব্যর ভাত খেতে নেই। তখন তার মা রোজ রাতে মাথার কাছে একবাটি পান্তাভাত রেখে শুতেন। বিছানা যাতে ভাতের সগ্‌ড়ি না হয় তাই শেষ রাতে উঠে নিজে গামছা পরে মেয়েকে টেনে বিছানা ছাড়িয়ে অন্ধকার থাকতেই ঐ পান্তা নুন দিয়ে খাইয়ে দিতেন।

তারপর সারাদিন মেয়ে এ-বাড়ি সে-বাড়ি খেলে বেড়াত। বেলা দুপুরে সব কাজ সেরে মেয়েকে নাইয়ে ধুইয়ে ভাত খেতে বসাতেন। খাওয়ানোর পরে তার গায়ে হাত বুলিয়ে এঁটো মুখ না ধুইয়ে গল্প বলে বলে ঐখানেই তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। মেয়ের ডান হাত চওড়া কলাপাতায় ঠেকানো থাকত—তার ওপর ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে সবশেষে পাথরের শিল চাপা দিতেন। হাত সরে যাচ্ছে কিনা আর মেয়ের ঘুম পাকা হল কিনা দেখে তবে নড়তেন। সূর্য ডোববার ঠিক আগে ছুটে এসে ঐ পাতেই আর চারটি ভাত দিয়ে মেয়েকে ঘুম থেকে তুলে খাইয়ে তবে মায়ের ছুটি হতো। এই পালা কতদিন চলেছিল তা তো মাকে জিগ্যেস করিনি!

ঘটনা, তা ১৩০০ সালের আগে হবে। আমার মা অনেক রকম বিয়ে দেখেছিলেন। পেতলের মস্তবড় থালায় মেয়েকে সাজিয়ে পুতুলের মতো বসিয়ে রেখে প্রায়ই বিয়ে হতো। ক'টি বিয়ে হয়েছে, কোথায় হয়েছে আমি এখন বলতে পারব না।

কুলোয় শুইয়ে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথাও মা শুনেছেন। হরবিলাস সরদার আইন পাস হবার মুখে (১৯২৮-৩০ সনে বোধ হয়) মাদারীপুর কালিয়া কুষ্টিয়া সর্বত্র এই ধরনের বিয়ে হয়েছে। এক বিয়েতে দেখেছিলেন বর ছাদনাতলায় একটা কি চুষে খাচ্ছে, আর কাঁদুনে মেয়েকে পাশে বসে মা দুধ খাওয়াচ্ছেন। দুধ খাওয়া শেষ হতে তাকে কেড়ে নিয়ে পিঁড়িতে চাপানো গেল না বলে বাড়ির কোনো ছেলেমেয়ে কোলে নিয়েই বরের সাতপাকে ঘুরে এলেন।

এসব মেয়েদের কারো কারো বিধবা হবার কথাও মায়ের জানা ছিল। আমার মনে নেই। মায়ের পিতামহের নাম শ্যামানন্দ সেনগুপ্ত। তিনি ছিলেন বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের ট্রানস্লেটর, *যশোর খুলনার ইতিহাসে* তাঁর নাম আছে। বিধবার সম্পত্তিতে অধিকার নিয়ে শ্যামানন্দ খুব লড়াই করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের তিনি সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর ধাত খানিকটা মা পেয়েছিলেন। বিধবার দুঃখে মায়ের প্রাণ চিরদিন কেঁদেছে। নিজে আমরণ সধবা ছিলেন। চার ছেলে, পাঁচ জামাই বর্তমান। কিন্তু সধবার গৌরব মা কখনো করেননি।

আমার এক দাদার মৃত্যুর পর নিজে সিঁদুর পরে ছেলের বৌকে দেখতে যেতে লজ্জা পেয়েছিলেন। নিজের হাতের শাঁখা নোওয়া মাথার সিঁদুর সব মুছে ফেলেছিলেন—বলেছিলেন, 'সিঁদুরের বাহার অনেক করেছি, আর নয়।' অথচ আমার দাদা যে এক ছেলে ছিলেন তাও নয় এবং মায়ের কোনো বুদ্ধিভ্রংশও হয়নি। এমন কোথাও শুনেছ? মা আজ বেঁচে থাকলে বিধবার যন্ত্রণা-কাহিনীতে তোমার ঝুলি ভরে দিতে পারতেন। এসব যে লিখে রাখার প্রয়োজন তা আমার মনে হয়নি।

বিধবা-মহল

বিধবা মহিলাদের দিকে নজর দেবার ঝোঁকটা পেয়েছিলুম আমার দিদি মুরলার কাছ থেকে। আমাদের বড়পিসিমা, অর্থাৎ বাবার বৈমাত্রেয় দিদি শিবমোহিনীর দ্বিতীয়বার

বিবাহ বিদ্যাসাগর মশাই দাঁড়িয়ে থেকে দিয়েছিলেন। এই ব্যাপার নিয়ে আমি স্মৃতিনির্ভর আলোচনা ইতিপূর্বে অন্যত্র করেছি (*বারোমাস*, শারদীয় ১৯৮৮, "শিবমোহিনী ও বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ")। সেখানে বলেছি যে শিবমোহিনীর সঙ্গগুণে মুরলার চরিত্রে যুক্তিনিষ্ঠা আর নানা ধরনের কল্যাণ-প্রবৃত্তি গড়ে উঠেছিল। ১৯৩৪-এ তিনি ঘরোয়াভাবে পাঁচজন মিলে বিধবা-সেবা-ভাণ্ডার গড়েছিলেন। শিবমোহিনী নিজে কতকগুলি বিধবার কাহিনী মুরলাকে দেন ১৯৩৪-৩৫ নাগাদ। তারপর ১৯৪২ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত দীর্ঘদিন মহিলা শিল্পভবন ও বিদ্যাসাগর বাণীভবনে যাতায়াত করার ফলে মুরলার কাছে বেশ মোটা একখানি খাতা এ ধরনের লেখায় ভরে ওঠে। বলা বাহুল্য, এই খাতা আর পাওয়া যায়নি। বিপিনচন্দ্র পাল মশায়ের কন্যা অমিয়া দেব নিজে থেকে তাঁর ঠাকুমার কাহিনী আর সিলেটের ক'জন মহিলার কথাও দেন। এইসব কাহিনী শুনে শুনে আমার মনেও বিধবা-জীবনের প্রতি সংগত কারণেই কৌতূহল জাগ্রত ছিল।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী তাঁর *মহাস্থবির জাতক*-এর দ্বিতীয় খণ্ডে বৃন্দাবনে বেড়াতে গিয়ে রিকশার পিছু পিছু একদা অতুল ঐশ্বর্যময়ী দিদিমণির একটা পয়সার জন্যে একমাইল ছুটে আসার যে কাহিনী দিয়েছেন তাতেই এক আঁচড়ে কোন সমাজ থেকে বেরিয়ে বিধবারা পথে বসতেন আর কিভাবে থাকতেন—সব বোধ করি বলে দেওয়া হয়েছে।

এপ্রিল ১৯৪০-এ রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর বাণীভবনে এসে মুখে মুখে যে ভাষণ দেন, তা কাছে থেকে বসে শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাতেও কবি তাঁর মায়ের সঙ্গিনী এবং আশ্রিতা নিরুপায় বিধবাকুলের পরচর্চাপ্রীতির উল্লেখ করেছিলেন বেশ স্পষ্ট মনে আছে। সম্ভবত কলকাতা শহরে ঐটিই কবির শেষ প্রকাশ্য ভাষণ।[২]

সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজের কমলা দাশগুপ্ত আর সিটি কলেজের উমা মৈত্রের সঙ্গে ১৯৫৫-তে আমি কাশী অঞ্চলে বেড়াতে যাই। উমার কাকিমা সুশীলা দেবী কাশীবাসিনী, তাঁর চেষ্টায় ঐ অঞ্চলে বাড়ির গায়েই এক ভাড়াটে বাড়িতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। সুশীলা দেবীকে সবাই 'সুশুমা' বলে দেখে আমিও তাই বলতে শুরু ক'রে দিলুম।

প্রথম থেকে কেমন ক'রে জানি না তাঁর সঙ্গে আমার গভীর ভালোবাসা গড়ে ওঠে। সুশুমা বালবিধবা, বারো বছর বয়েসে স্বামীকে হারান। এখানে বসে তাঁর সাহায্য আমি পদে পদে পাই। বাড়ির পাশে পাতালেশ্বর শিব দেখে আমি সবিশেষ পুলকিত হই। আসার আগে পড়েছিলুম যে মহারাজা রাজবল্লভের বন্ধু রামানন্দ ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জায়গাটির আদি নাম ছিল রামানন্দ সরকারের হাবেলি। এই রামানন্দ আবার প্রিয়নাথ সেন মশাইয়ের (টেগোর ল লেক্‌চারার) উর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ।

একতলা বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে তবে জলের মধ্যে পাতালেশ্বর, ঠিক যেন পুরীর 'বাট লোকনাথ'। এতদিনের পুরনো মন্দিরে পুজোর ঘটাপটা না দেখে মনে দুঃখ পেলুম। আমার মন্দির-প্রীতি দেখে সঙ্গীরা হাসলেও ওখানকার মহিলারা সব খুশি হলেন।

যাই হোক, ঐ পাতালেশ্বর পাড়াতেই একটি তিনতলা বাড়ি দেখলুম যার তিনতলায়

মালিক কোনোমতে টিকে আছেন, আর দোতলা এবং একতলা জুড়ে নানা দেশের বিধবা মহিলারা সতেজে এবং সরবে বিরাজ করছেন। একই বাড়িতে এতগুলি বিধবা থাকায় বাড়ির নামকরণ করি 'বিধবা-মহল'। ঠিকানা আজও মনে আছে—৩২/৮৮ পাতালেশ্বর।

সুশুমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দোতলা-একতলার সকলের সঙ্গেই আলাপ ক'রে এলুম। কে কাঁথা সেলাই করেন, কে বড়ি দেন, আর কে কী বললে খুশি হন সে-সবও জানা হয়ে গেল। এদিকে মহালয়ার পরেই আমাদের পুজোর ছুটি হয়েছিল। তখন দেবীপক্ষ। কাশীতে তখন পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা, নিত্যি নানা মচ্ছোব, নবদুর্গা দর্শন—কত কি যে শুরু হয়ে গেল বলে থৈ পাওয়া যায় না। নতুন আলাপী মহিলারাই আমাদের সঙ্গিনী হতেন, স্নান ও পুজোর পরে গরম জিলিপি খেয়েই ওঁরা খুব খুশি হতেন।

একজনের বাড়িতে দেখলুম বোধনের দিন থেকে মানসিকের ধুনী জ্বালানো। দুই হাঁটুতে হাতে মাথায় জ্বলন্ত সরা রেখে ধুনো পোড়ানো হল—মানসিক শোধ। শিবনাথ শাস্ত্রী মশায়ের মা-ও এমনধারা ধুনী জ্বালিয়েছিলেন বলে আচার্যদেব তাঁর আত্মচরিতে লিখে গেছেন। ভয়ংকর কাজ আগুন নিয়ে খেলা। আর দেখতে ইচ্ছে হয়নি কোনোদিন। শুনলুম মহাষ্টমীর দিন মিশনে কুমারীপুজো আর এ-বাড়িতে সধবা পুজো। তা আমরা বাড়িতেই রয়ে গেলুম।

ক'জন বিধবা টাকা তুলে কাছাকাছি একটি সাদাসিধে ব্রাহ্মণের সধবাকে ডেকে আনলেন। তার জন্যে কেনা হয়েছিল লালপেড়ে কোরা শাড়ি শাঁখা আর জলখাবার। উনিশ-কুড়ি বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে এল। প্রথমে এদের কথামতো সে চারদিকে গঙ্গাজল ছিটিয়ে সব শুদ্ধ ক'রে নিল। তারপর সে নিজের কাপড় ছেড়ে এঁদের কোরা কাপড়টি মাথায় ছুঁইয়ে পরলে। আগে তা থেকে একটা লম্বা সুতো বের ক'রে দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে বললে, 'কাঁটা নাও, খোঁচা নাও, আগুন নাও, ইঁদুর নাও।' তারপর সুতোটা পাকিয়ে ঈশানকোণে ফেলে দিলে। তাকে এঁরা শাঁখা-সিঁদুর পরিয়ে কপালে টিপ আর চোখে কাজল দিয়ে শেষে পায়ে আলতাও পরিয়ে দিলেন। পিদিম জ্বলল, শাঁখ বাজল। নিমকি ভাজাভুজি আর আদাকুচি মাটির থালায় দিয়ে তারপর কলাপাতায় পান্তুয়া চমচম প্যাঁড়া আর খুরি ভরে রাবড়ি তাকে ধরে দিয়ে শেষে হাতে পান দিলেন। মুখ দেখে মনে হল মেয়েটি খুব খুশি হয়েছে। তার খাবার পর পাঁচজন মেয়ে একটি ক'রে সিকি দিয়ে বয়েসে বিস্তর বড় হয়েও ঐ ছোট মেয়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন।

এমন সধবা পুজো আমি আগে বা পরে কোনোদিন দেখিনি। ওখানে আমরা তিনজন ছিলুম ব্রাহ্মণ বৈদ্য আর কায়স্থ। পাশাপাশি আমাদের দেখে গিন্নিরা বললেন, 'এ যে দেখছি তেরোস্পর্শ গো!' আমি বললুম, 'তা আমাদেরও কিছু টাকাটা সিকেটা পাইয়ে দিন।' শশীদিদি বললেন, 'মেয়েগুলি ভালো, তা ধাড়ি ধাড়ি আইবুড়ো মেয়ে,

এদের আবার কী দেবে ? বামুনের সধবা হলেও বা কথা ছিল।'

তারপর নবমীর দিন বেরিয়ে সার গুরুদাস বাঁড়ুয্যে-প্রতিষ্ঠিত সোনার রামচন্দ্র দেখলুম। রাজরাজেশ্বরী গলিতে এক বাড়িতে মা-দুর্গাকে সোনার পাটিহার তিনদিন পরানো হতো। তা দেখে ভক্তিভরে পুষ্পাঞ্জলি দিলুম। একজনের বাড়িতে (ময়মনসিং জেলার কারা যেন) কার্তিক ঠাকুরের ধনুকটি আগাগোড়া সোনার। এইসব দেখা হল। শুনলুম পূর্ব বাংলা থেকে এসে যাঁরা পুজো করেন তাঁরা মাকে তিনদিন লুচি পোলাও পায়েস খাইয়ে দশমীর দিনে ভোগে পান্তাভাত, কচুশাক, কুলের অম্বল দেন। কেননা শিবের কাছে ফিরে গেলে মায়ের শাশুড়ি হয়ত জিগ্যেস করবেন—বাপের বাড়িতে ক'দিন কি খেলে গো! পান্তাভাত আর কচুশাক শুনে তখন শাশুড়ির প্রাণ ঠাণ্ডা হবে!

সে যাক, আমাদের মহলে ফিরে আসি। দোতলার রাঙামা ছিলেন পরমা সুন্দরী। অমন ধবধবে ফরসা বড় দেখা যায় না। লাঠি ধরে ঝুঁকে চলতেন। তাঁকে সবাই খুব মানতো। তিনি ছিলেন বর্ধমানের কোনো জমিদারবাড়ির বৌ। রাজশাহি, বীরভূম, কাটোয়া, হুগলি থেকে আসা চার-পাঁচজন সুন্দরী শান্তশিষ্ট বৃদ্ধা একসঙ্গে এই দোতলায় থাকতেন। এঁদের অবস্থা বেশ ভালো ছিল— পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ পুজো দিতেন। রাঙামা পুজোর ক'দিন কলাইয়ের ডালের অতি উপাদেয় হিঙের কচুরি আর আলুর দম খাইয়ে বলেছিলেন আগে আগে কচুরি আলুর দম সব আলুনি থাকত। আজকাল বিচার-আচার উঠে গিয়ে অব্দি তরকারিতে নুন পড়ছে। এরা বেশ ভারিক্কি। খুব স্তোত্রপাঠ আর জপ আহ্নিক করতেন। কবে কাশী এলেন, তখন কী বাজারদর ছিল, কোন ঘাটে কীর্তন ভালো, কে ভালো কথকতা করে—এর বেশি কথাবার্তা মনে পড়ে না।

জমজমাট ছিল একতলাটা। এলোকেশীদিদি কথা কইতেন খুব উঁচু গলায়। বাড়িওয়ালার সঙ্গে তো তাঁর বনত না। তিনি নাকি তাঁর শিষ্যের কাছ থেকে এই বড় তিনতলা বাড়ি দানস্বরূপ পেয়েছিলেন। তাই এলোকেশীর মতে এটি 'ভিক্ষের বাড়ি'। বলতেন, 'ওগো রামেশ্বর, মনে রেখো বাপের পয়সায় বাড়ি গাঁথোনি বাছা, আমরা বামুনের মেয়েরা আছি, যতদিন বাঁচব, থাকব। অত কথা কিসের!' বাড়িওয়ালাকে এইসব শোনালে তবে নাকি সে ঠাণ্ডা থাকত। এই পর্ব সপ্তাহে দু'একবার হতো।

এলোকেশী আর তার দলের মেয়েদের চিঠি আমি প্রায়ই লিখে দিতুম। সকলের চিঠির বয়ান একই— 'অমুক কেমন আছে, তার এখন ক'টি ছেলে ? ক'জনের বিয়ে হয়েছে ?' তারপরই 'জ্যাঠাই/খুড়ি/পিসি/মাসিকে মনে পড়ে না বাপ আমার ? একবার বেড়াতে এসো, দেখে যাও ধন/মণি। দু'চারটে টাকা পাঠিয়ো, ভগবান তোমায় শতগুণ দেবে—' ইত্যাদি ইত্যাদি।

একতলার দু-তিনজন ছিলেন কেদার-বদরি ফেরত। লোকের থেকে চেয়েচিন্তে একরকম না খেয়েই আগাগোড়া পায়ে হেঁটে পাড়ি দেওয়া। কেদারনাথ-দর্শন ক'রে এলোকেশীর এমন আনন্দ হল যে তিনি ফেরার সময় পা থেকে দড়ির জুতো ফেলেই

দিলেন। বরফের পথে খালি পায়ে হেঁটে দু'পায়েরই ছোট আঙুলগুলো প্রায় খসে গেছল।

এঁদের উঠোনে একটি জলের কল, তা থেকে খুব চওড়া ধারায় জল পড়তে দেখতুম। এত জল, তবু রোজ জল-কল নিয়ে এত ঝগড়া হয় কেন শুধোতেই এলোকেশী, গোপালী, সুভাষ সবাই একযোগে স্বর্ণদিদির কুচ্ছো করলেন। তিনি নাকি ভোর চারটে থেকে ছ'টা পর্যন্ত কল জুড়ে থাকেন। তখন ঘর থেকে কারো বেরুবার যো নেই! পাঁচবার কাপড় কাচেন, খাবার জল, ফেলার জল সব নিয়ে হৈ হৈ কুলুকক্ষেত্তর! তাছাড়া স্বর্ণদিদির এমন বজ্জাতি যে জলের কলগোড়ায় এসে কাপড় গামছা কিছুই গায়ে রাখেন না। এমন বেহায়া মেয়েমানুষ বাপের জন্মে নাকি কেউ দেখেনি। আবার বলেন— 'আমি কাপড় পরি-না-পরি তা তোরা বলবার কে? নজ্জাবতীরা ঘরে দোর দিগে যা, তা তোদের ঘরে কে থাকে না থাকে, আমি কি দেখতে যাই!' স্বর্ণদিদির মাথা খারাপ, এ-কথা বলাতে সবাই আমাকে বকতে লাগলেন। আমি কিন্তু জানতুম কলকাতায় গ্রে স্ট্রিটে সে আমলে ছাত্রবৃত্তিপাস এক মহিলা, ডাকসাইটে উকিলের পরিবার—তাঁরও এমন ধারা বাই ছিল।

যাই হোক, ক'দিন ধরে অনেক রকম চেষ্টাচরিত্র ক'রে একদিন স্বর্ণদিদির ঘরে ঢোকার অনুমতি পেলুম। কী ছিমছাম ঘর—সব ঝকঝকে তকতকে দেখে চমকে উঠতে হয়। মাথার কাছে অতি সুদর্শন এক যুবকের ছবি—বয়েস কুড়ি কি বাইশ হবে। তাঁর পরিচয় জিগ্যেস করাতে বেশ একটু চড়া গলায় বললেন— 'বিধবার ঘরে আবার কোন ব্যাটাছেলের ছবি থাকে গো? বড়ডো ন্যাকা মেয়ে বাপু তুমি।' তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'উনি জলপানি পেয়েছিলেন। পাস ক'রে আইন পড়বার ইচ্ছে ছিল। খুব সৌখীন ছিলেন, চা খেতে বড় ভালোবাসতেন।' এই দু-পাঁচ কথা।

আমি হঠাৎ চেয়ে দেখলুম যে যদিও দিনরাত জল ঘেঁটে স্বর্ণদিদির হাতে-পায়ে হাজা, তবু তাঁর মাথায় পাট-পাট ঢেউ-খেলানো চুলগুলো সবই কালো। আবার বললেন, 'দেখো, যেন কিছু ছুঁয়ে দিও না, শেষে কাচতে হবে। বিয়ে করোনি কেন? বাপ নেই বুঝি? কে দেখবে গো? আমাদের তবু এই সোনার কাশী আছে, এ আর থাকবে না—ডুবছে, আরো ডুববে।' তারপর শিশি খুলে দু'টো এলাচদানা দিয়ে বললেন, 'খাও, কালভৈরবের প্রসাদ।'

স্বর্ণদিদির ঘরে ঢুকেছি, এত কথা বলেছি শুনে সুশুমা সুদ্ধু অবাক হয়ে বললেন, 'ওমা, রাজ্যি জয় ক'রে এসেছ গো। আমিও যাইনে—যে বিচারী! তাছাড়া বেজায় কুঁদুলে, ভয় পাই। তবে হ্যাঁ, তাই বোধহয় স্বর্ণদিদি চা খায় না, স্বামী ভালোবাসত বলে।'

সুশুমা নিজের কথা সামান্যই বলেছিলেন। তাঁর শ্বশুরবাড়ি ছিল পূর্ণিয়ায়। বন্ধু উমা বলেছিল স্বামীর কথা একটুও কাকিমার মনে নেই। নিজের বড় জায়ের সবকটি ছেলে ওঁর হাতেই মানুষ। ভাশুরপোর চারটি মেয়ে, একটিও ছেলে নেই। তাই আমার সঙ্গে বীরেশ্বর শিবমন্দিরে গিয়ে পদ্মফুল চড়ালেন শিবের মাথায়। ভাশুর-জায়ের কাছে কোনো

দুঃখ যন্ত্রণা পাননি, এইটুকু সান্ত্বনা। 'তবে মা, মেয়েমানুষের সংসারের আশা বড় আশা—তা আর মেটে না। যাক, কাশী এসে নিজের কথা আর ভাবিনে। দেখি তো এখানে যারা আসে প্রথম প্রথম টাকা আসে। কুড়ি পনের দশ কতরকম মাসোহারা। কিছুকাল যেতে না যেতে পাঁচে দাঁড়ায়। তারপর বছর ঘুরতেই ছেলেপুলেরা ঝাঁপ বন্ধ ক'রে দোকানপাট তুলে দেয়। তখন বিধবাই বিধবাকে দেখে। তাছাড়া মা-গঙ্গাকে দেখে ঘাটে বসে শিবের মাথায় জল দিয়ে দিয়ে দিনগুলো কেটে যায়। কিছু করার নেই, তাই এত কোঁদল। তার আবার রকমফের বলি শোনো। নিত্যিকার ব্যাপার ঘরের জল নিয়ে হল বাঁধা কোঁদল, বংশ তুলে দেশ গ্রাম নিয়ে মারামারি হল সাধা কোঁদল মাঝ-মধ্যিখানে ঘটে। তীর্থে যাওয়া কি ঠাকুরবাড়ির পাওনা-থোওনা নিয়ে অশান্তি—এরা সব উটকো কোঁদল—আসুন্তি যাউন্তি— দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে আর ফস্ ক'রে নিবে যায়।'

সুশুমার কথামতো ও-বাড়ির দুই প্রায় অথর্ব বিধবাকে নিয়ে গঙ্গার পূর্ব পারে রামনগরে বেড়াতে যাই। চল্লিশ বছর কাশীবাস করেও তাঁরা কাশী-নরেশ প্রাসাদ ও সুমেরু মন্দিরে দুর্গাবাড়ি দেখেননি। যা হোক, ফিরে এসে খুশি হয়ে তাঁরা বিস্তর আশীর্বাদ ক'রে বললেন, 'রোসো, তোমাদের এমন জায়গায় নিয়ে যাবো যা তোমরা কখনো দেখোনি শোনোনি।' দু'দিন পরেই রাত চারটেয় উঠে বজ্রযোগিনীর মন্দির—সেই চক পেরিয়ে। নাম শুনে ভেবেছিলুম বৌদ্ধ তন্ত্রের বিলুপ্ত কোনো চিহ্ন হয়ত চোখে পড়বে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা দেখলুম তা হল কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুরের ফোঁটা-কাটা ষণ্ডামার্কা ওদেশী পাণ্ডার উৎকট প্রতাপ।

মন্দিরের প্রধান দরজায় না গিয়ে আমাদের ঢোকানো হল গলি দিয়ে। দেবীর সামনে মেয়েরা দাঁড়ালে, এমন-কী ঘরে ঢুকলেও মন্দিরে অশুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই দোতলায় উঠে কাঠের ছাতের ফোকর দিয়ে দেখতে পেলুম শুধু দেবীর একটি হাত মাত্র। পাশেই দেখলুম নিচে নামবার কাঠের সিঁড়ি। তা দিয়ে যেই দু'চার ধাপ নেমেছি অমনি অনেকগুলো রুদ্রাক্ষের মালা পরা কাপালিকের মতো এক পাণ্ডা মস্ত ত্রিশূল নিয়ে তেড়ে এসে আমাকে বললে, 'তুম্হাকে হামি আভি গেঁথে দিবে।' (বাংলা একটু জানত মনে হয়)। আমার সঙ্গীরা একযোগে 'হায় হায়' করতে লাগলেন। আমিও উঁচুগলায় আবোল-তাবোল হিন্দিতে 'নিয়ম কানুন জানিনে' বলবার চেষ্টা করতে লাগলুম। পাণ্ডাজি হাতমুখ নেড়ে বিকট সুরে থিয়েটারি ভঙ্গিতে বলে চলল, 'জানো, এই যোগিনীমায়ীকে দেখলেই তোমার মুখ শুয়োরের মতো বেঁকে যেত! আর আমাদের দেবীজিকে শুদ্ধি করাতে হতো—দুর্গাপাঠ, রুদ্রপাঠ সব দিয়ে পঞ্চাঙ্গ শোধন কম্‌সে কম তিনশো টাকা পড়ত। তোমার ঐ আওরৎলোগ আটক হতো টাকা না দিলে।'

ঠিক কী কৌশলে ব্যাপারটা মিটল আজ আর মনে পড়ছে না। কাশীর মাসিদের কারো পূর্ব-পুরুষের দান ছিল ওখানে—তাতেই হবে বোধহয়। তাঁরা বললেন, 'তুমি কি সাংঘাতিক মেয়ে বাছা, এমন জানলে কি তোমার সঙ্গে আসি!' সকাল সাতটা বাজতেই মন্দির বন্ধ হয়ে গেল।

পাতালেশ্বরের বাড়িতে এই বিধবারা কেউ চাকরি বা কোনো কাজ করতেন না। কিন্তু বাঙালিটোলা, হাড়ারবাগ, সোনারপুরা—এসব অঞ্চলের প্রায় অনেকেই কাজ করতেন। সুশুমা প্রথম থেকে আমাদের খাবার জন্যে বিন্দুমায়ের ভাণ্ডারের ব্যবস্থা ক'রে দেন। বিন্দুমা আর শোভামা দু'জনে বাড়ি বয়ে এসে নিজেদের বাসনে ক'রে রোজ সুক্তো, ডাঁটাচচ্চড়ি, ছেঁচকি, ঘণ্ট, অম্বল কত কি যে আনতেন ! পুজোয় বিজয়া আর লক্ষ্মী-পূর্ণিমায় রাঙাআলুর পুলি-পায়েসও খাইয়েছিলেন।

১৯৪৬-এ যখন বাড়ির সকলের সঙ্গে কাশী গিয়ে বছরখানেক থাকি তখন আমাদের বাড়িতে ছিলেন এক বামুন মাসিমা। তাঁর বাড়িতে এবারে গেলুম। সোনারপুরায়, ধোবাপাড়ায় গলিতে ঘরের কোণে ছাতে বসে বসে বামুনমাসির এই কাহিনী শুনি :

ওমা তুই এসেছিস, কী ভাগ্যি আমার ! বোস, বোস, —আমার কথা আবার কি শুনবি ? —জানিস, বাঙাল দেশে আমার বাড়ি ছিল। তা আমার কথা শুনে বুঝবি কি ক'রে ? চল্লিশ বছর এখানে আছি, ঘর ছেড়েছি সেই সতেরো-আঠারো বছর বয়েসে। দেশের লোকের মুখও দেখতে পাইনে। শোন তবে। আমার স্বামী ছিল মা-বাবার একমাত্র সন্তান, শাশুড়ি বিধবা। তার হঠাৎ তেড়ে-ফুঁড়ে জ্বর এল একদিন। ম্যালেরিয়া মনে ক'রে চিকিৎসা হল। শাশুড়ি খুব কেপ্পন ছিলেন, নতুন ডাক্তার দেখাব বলেও দেখালেন না। বুদ্ধি দেবারও মানুষ কেউ ছিলেন না। একরকম হঠাৎই সে চলে গেল। শাশুড়ি কাঁদলেন, আমিও কাঁদলুম। তারপর দিন আর কাটে না। আমাদের অনেক জমিজমা গোরুবাছুর ছিল। শাশুড়ি তা থেকে ফলপাকুড় তরি-তরকারি বেচতেন। ঘর বোঝাই থাকত শুকনো নারকোলে। কাউকে হাত তুলে দিতে পারতেন না, রোজ দু'চারটে ক'রে ফেলা যেত। দুধ-সর থেকে ছানা-মাখন করেও বাজারে বেচতেন। আমাকে ঘরে শেকল দিয়ে উনি হাটে যেতেন। একদিন আমার পা লেগে মস্ত কড়াভর্তি দুধ উল্টে গেল। শাশুড়ি উনুনের জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে তেড়ে এলেন। আমি ছুটে মাঠে গিয়ে সজনেতলায় ঝোপে লুকিয়ে রইলুম। আবার একদিন টাটকা আড়াই সের মাখন বেড়ালে খেয়ে গেল। বারকতক এইরকম হল। শাশুড়ি বুক চাপড়ে চাপড়ে শেষে কাঁদতে কাঁদতে পুকুরে ডুবে মরতে গেলেন। পাশের বাড়িতে খবর দিতে লোক এসে তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তুলে আনলো। বাড়ি এসেই বললেন, অমন অলক্ষ্মী বউয়ের মুখ আর দেখবেন না। দূর ক'রে দেবেন ইত্যাদি।

বাড়ির কাছাকাছি গোটাকতক বেয়াড়া মানুষ ছিল। তাদের নজর ভালো ছিল না। আমি সব বুঝতুম। আমাদের গাঁয়ের জমিদার-গিন্নি তীর্থে যাচ্ছিলেন। খবর পেতেই তাঁকে ধরে কেঁদে-কেটে চলে গেলুম। তাঁর খরচেই নৌকোয় ইস্টিমারে এলুম। হাওড়া থেকে আড়াই কি তিন টাকা কাশীর ভাড়া। বড় গিন্নি উঠেছিলেন অহল্যাবাঈ ঘাটে। তাঁর কাশীর কাজ সারা হল। শেষে আমাকে নিয়েই জ্বালা। ওখানকার বাঙালি মেয়েরা বললে— 'ওকে নিয়ে গিয়ে কেদারঘাটে তারকবাবার জিম্মে ক'রে দাও, সে হল গিয়ে বিধবার মা-বাপ।'

থাকতে থাকতে আস্তে আস্তে সব সড়গড় হয়ে গেল। এখন এই অন্ধকার ঘরটায় থাকি, মাসে আট আনা ভাড়া। সঙ্গে কিছু টাকা এনেছিলুম, কোঁচড়ে বাঁধা ছিল সোনার কানফুল, দু'টো ভারি বালা, একছড়া হার—সব গেছে পেটের জ্বালায়। তবু এখন ঘরে-ঘরে কাজ নিয়ে ধার দেনা থেকে রেহাই পেয়েছি। সন্ধেয় এই ছাতটায় পড়ে থাকি, কেটে যায়। বড়লোকের গিন্নিরা কাশী এসে খুব আরাম করে, তেল মালিশ করিয়ে নিয়ে বেশ ভালো পয়সা দেয়। বামুনের মেয়ে হয়ে জন্মে কী আর হল বল? তবু কেমন ঘেন্নায় ঐ কাজ নিতে পারলুম না। তুই উঠচিস! দেখ, কাজকর্ম তো করছিস, মধ্যে মধ্যে মাসি বলে দু'পাঁচটাকা দিস না পাঠিয়ে!' তারপর ছুটে গলি থেকে কিনে এনে ভালো প্যাঁড়া খাইয়ে দিলেন।

ফিরে এসে টাকা পাঠানোর কথা ভুলেই যাই। তাঁর সুন্দর মুখখানা একটু আবছা মনে পড়ে, নাম-ধাম সব ভুলে গেছি।

এক্ষণ, শারদীয় ১৩৯৮

বৈধব্য কাহিনী ২

ফরাসি পিসিমা

এক্ষণ-এ দু'বছর আগে চার-পাঁচজন বিধবার কথা লিখেছিলুম ('বৈধব্য-কাহিনী', শারদীয় ১৩৯৮)। তা পড়ে কেউ কেউ বলেছেন— 'শুধু নিষ্ঠাবতী বিধবাদের কথাই লেখা হয়েছে কেন ? অন্য ধরনের মানুষও তো ছিলেন—নিয়মনিষ্ঠায় আর জীবনযাত্রায় যাঁদের রীতিমতো শৈথিল্য ছিল !' কিন্তু আমি তো বিধবা-চরিত নিয়ে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখিনি, একান্নবর্তী পরিবারে গণ্ডির ভেতর থেকে যাঁদের দেখেছি তাঁদের সম্বন্ধে যা মনে পড়ে তাই লিখেছি। আজকেও সেই পুরনো পুঁজি ভাঙিয়েই বলতে চলেছি।

প্রথমে যাঁর কথা মনে পড়ছে তিনি আমার বাবার দূর সম্পর্কের দিদি, অর্থাৎ আমার পিসিমা। গুরুজনদের সঙ্গে বয়সের হিসাব ধরে দেখা যায়—এঁর জন্ম আন্দাজ ১৮৭০-এ, যে বছর কালীপ্রসন্ন সিংহের মৃত্যু হয়। সত্যিই আমার এই পিসিকে বলা চলে বাবু কালচারের প্রত্যক্ষ শিকার।

পিসিমার নাম ক্ষীরোদবাসিনী। বাপেরা ছিলেন হুগলির বহু সম্পন্ন জমিদার-গোষ্ঠীর কোনো এক শাখা। দশ বছর নিঃসন্তান থাকার পরে অনেক স্বস্ত্যয়ন আর যজ্ঞের শেষে মায়ের কোলে তাঁর আগমন। আদরে মাটিতে পা পড়ত না। মেয়েকে নিয়ে কি করবেন মা-বাবা ভেবে পেতেন না। তাঁর নিজের ভাষায় 'মাথায় রাখলে উকুনে খায়, ভুঁয়ে রাখলে পিঁপড়েয় খায়' ! ক্ষীরোদার মা বলেছিলেন— 'আমি বাঁজা বলে সকালে উঠে কেউ আমার মুখ দেখত না। তোমার জন্মের পর থেকে মহালের আয় বেড়ে গেল। কর্তা মামলা জিততে লাগলেন একের পর এক। তিনি বলতেন, "ক্ষীরো আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী"। আমি যখন বলতুম— "মেয়েকে অত আদর দিও না, শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে হবে"। কর্তা বলতেন— "এমন ঘরে বিয়ে দোব, যে জল গড়িয়ে খেতে হবে না"।' তা হয়েছিলও তাই।

দশবছরে পা দিতে না দিতে সম্বন্ধ আসতে লাগল। এই সম্বন্ধ আনলেন গোঁদলপাড়ার মিত্তিরেরা। খোঁজপত্তর নেওয়া হল সবদিক দিয়ে, টাকা-পয়সা স্বভাব-চরিত্র কোথাও কোনো খুঁৎ নেই। এগারোয় পা দিতেই চন্দননগরে বোসেদের বাড়ি বিয়ে হয়ে গেল, যাদের সেই স্বরূপ বোসের ঘাট। মির্জাপুর থেকে নৌকোয় লালচে পাথরের বড় বড় টালি আনিয়ে বাঁধানো আটকোণা দুই মস্ত চাতালওয়ালা বিরাট ঘাট।

ওরকম ওদিকে আর ছিল না।* বাড়িঘর তদুপযুক্ত, রথ দোল অন্নসত্র বাঁধা। পাত্র সিদ্ধেশ্বর অতি সুদর্শন, ছিপছিপে লম্বা, মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল, আবার এনট্রান্স পাস। বাড়ি-বাড়ি সামাজিক সিধে পাঠানো হল। পড়শি কুটুমেরা সাতদিন ধরে ভোজ খেয়ে শতমুখে সুখ্যেৎ ক'রে গেলেন। বাজি পোড়ানো হল, গড়ের বাজনা, বাইনাচ—যা যা হবার কথা সবই হল।

শাশুড়ি ছিলেন মাটির মানুষ, কোনোদিন উঁচুগলায় কথা বলেননি। সংসারে ভাসুর দেওর ননদ কেউ ছিল না—সবেধন নীলমণি এক সিদ্ধেশ্বর। শ্বশুর বলেছিলেন ছেলেকে এফ. এ. পাস করিয়ে নিজে জমিদারির কাজ শেখাবেন। পর পর আমার একটি ছেলে আর দু'টি মেয়ে হবার পরেই মহাল থেকে টাকা নিয়ে ফেরার পথে প্রায় নৌকোর মধ্যেই ক্ষীরোদের শ্বশুরের আকস্মিক মৃত্যু ঘটল। নায়েব-গোমস্তা কিংবা ছেলে কেউ এর জন্যে তৈরি ছিলেন না। ছেলেকে লেখাপড়া ছাড়তে হল। একদল চতুর মোসাহেব ঝাঁপিয়ে পড়ে বৈঠকখানা জুড়ে বসলেন, সিদ্ধেশ্বর হলেন সিধুবাবু। তারপর একে একে যা ঘটতে লাগল সেই বাবু-বৃত্তান্তের ইতিহাস নতুন ক'রে আবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই। শেষের পালার কথাই সংক্ষেপে বলি।

'একে একে অন্নসত্র রথ দোল বন্ধ হল, মহালের পর মহাল বাঁধা পড়তে লাগল। নায়েব মশাই কোনোমতে অতি সামান্য কিছু টাকা এনে দিয়ে লুকিয়ে রাখতে বললেন, মেয়ের বিয়ের জন্যে। বাবু কখনো-সখনো বাড়ি এলেও আমার সঙ্গে কথা কইতেন না। চাবি নিয়ে সিন্দুক থেকে মোহরের থান নিয়ে যেতেন। ক্রমে ক্রমে ঘরে বাইরে সব জানাজানি হয়ে গেল।'

ভয়ংকর সব ঘটনার যুগ-যুগান্তর পরে পিসিমা বোধহয় নিজে থেকেই মাকে বলেছিলেন—মাথার ওপরে শাশুড়ি ছিলেন, সংসার সামলাতেন, আমি ঘোমটা দেওয়া বৌ ছিলুম। তিনটে কচি ছেলে নিয়ে পথে বসব ভাবতে ভাবতে দজ্জাল হয়ে উঠলুম। বাইরে দু'টো রক্তচোষা ছিল, ইয়ারগুলো সর্বদা ভনভন করত। ঘরে তো আমি একটু শান্তি দিইনি! দেখা হলেই চেঁচাতুম—ঐ এলেন আমার সব্বোনাশ করতে। এদানী একটা মিষ্টি কথা আর বলিনি, দু'দণ্ড বসতে বলিনি, একঘটি জলও দিইনি।

নায়েব মশায় এসে বলে গেলেন বাড়িখানাও যাবে, বাবুকে মুখের কথায় কেউ আর ধার দিচ্চে না। আমি বললুম—গলায় কাটারি মারব, ছেলেগুলোকে আমি কি বাপের বাড়ি থেকে এনেছিলুম—ওরা ভিক্ষে করবে—কেন? কাটারি হাতে নিইচি আর চেঁচাচ্চি। ঐ সব শুনে বাবু এসেই বললেন— 'আহা, তাই দাও।' কাছে এসে বললেন, 'তুমি মরো, আমি ফাটকে যাই— ষোল আনার ওপর আঠারো আনা হোক।' মরতে

* পিসেমশায়ের মৃত্যুর পরে ঘাটের চাতাল ও সিঁড়ি ভেঙে পাথর বিক্রি ক'রে ফেলা হয়। এলাহাবাদের রামধন মুখুয্যে যাঁকে রামকমল সেন ওদেশে আনেন, কীডগঞ্জে যমুনার পাড়ে পাথরের বাঁধানো তাঁর বিরাট ঘাট ছিল। সে ঘাটের সুন্দর পাথরও এভাবে নিলাম হয়ে বিক্রি হয়ে যায়। *বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী*, ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

পারলুম না, এলোমেলো কাটারি চালিয়ে কিছু রক্তারক্তি হল। চারিদিকে শত্তুর, কে যেন গিয়ে পুলিশে খবর দিলে, বাবুকে ধরে নিয়ে গেল—স্ত্রী হত্যে করতে যাচ্ছিলেন রটে গেল।

ভর দুপুরে বেরিয়েছিলেন, ফিরতে বিকেল বয়ে গেল। টকটকে লাল চোখ নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে জ্বর গায়ে বিছানা নিলেন—বললেন, 'বোসবাড়ির বৌ যাবে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিতে!' ঐ শেষ কথা। তিনদিনের জ্বর বিকারে চলে গেলেন। দেখেশুনে শাশুড়ির যেন বাক্‌রোধ হল, একবারও কাঁদেননি। হুড়মুড়িয়ে কাশী চলে গেলেন, পাছে ছেলের শ্রাদ্ধ দেখতে হয়। তারপর কি কি হল মনে নেই। অত সম্পত্তি একা মানুষ ক'বছরে ওড়াতে পারে না। কিসে সই দিচ্চেন, কাকে দিচ্চেন চেয়েও দেখতেন না। পাকা বাবুরা নাকি তাই করে! এগারো বছর বয়েসে ও-বাড়িতে ঢুকেছিলুম, তিরিশ না পেরুতে সব ফুরুলো। নায়েব মশাই ছেলেদের সঙ্গে আমাকে নিয়ে চুঁচড়োর ক্যাঁকশেয়ালিতে (কনকশালি) একটা ছোট ভাড়া বাড়িতে আমাদের রেখে এলেন—সেই থেকে আজ হেতা, কাল হোতা, মা যেমন চালাচ্চেন—রথ তেমনি চলচে।

আমাদের বাড়িতে এই ক্ষীরোদা পিসিমা বছরে একবার আসতেন কোম্পানির কাগজে সুদ ভাঙাতে—থাকতেন মাসখানেক। পিসিমার বয়েস তখন আন্দাজ পঁয়ষট্টি হবে। শরীরের গড়ন খুব আঁটসাঁট। গায়ের রং উজ্জ্বল টকটকে। মাথার চুল ছাঁটা, কিন্তু কুচকুচে কালো। ধবধবে সাদা থান পরা গায়ে জামা দিতেন না। কিন্তু খুব আব্রু রক্ষা করে চলতেন—ঘরে নতুন কেউ এলেই মাথায় কাপড় দিতেন। ভোরবেলায় গায়ে-মাথায় সরষের তেল মেখে বারোমাস ঠাণ্ডা জলে স্নান করতেন। গলায় থাকত শুধু একটি রুপো-বাঁধানো রুদ্রাক্ষের মালা। আর কোনো গয়নার বালাই ছিল না। একটি আঙটিও পরতেন না। আমাদের কাছে এলে মা ওঁকে কাশীর কালভৈরবের ডোর কিংবা তারকনাথের তাগা পরিয়ে দিতেন। তাতে আপত্তি করতেন না।

আমাদের নিতান্ত গেরস্তালী ধরন, কমদামী বাসন-কোসন, সামান্য রকম খাওয়া শোওয়া তাঁকে বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়েছিল। একে অসম্ভব জ্বলজ্বলে চেহারা, তায় তাঁকে ঘিরে নানা রগরগে জমাটি গল্প। যে-জন্য তাঁকে আড়ালে বলা হতো 'ফরাসি পিসিমা'। আমি মুগ্ধ ভক্তের মতো দিনরাত্তির তাঁকে ঘিরে থাকতুম। তেল মাখতে খুব ভালোবাসতেন। কাছে গেলে বলতেন, 'তুই আগে পিঠে তেল ঘষে দে—অনেকক্ষণ ঘষলে তবে তোর হাত একটু নরম হবে, যে শক্ত কাঠের মতো হাত! পা-টা বড্ড কামড়াচ্ছে—দে একটু টিপে।' আপনমনেই বলতেন, 'বাড়িতে দু'টো দাসী ছিল, একটা মাথায় তেল দিত অন্যটা পা টিপত—তারাও ছিল সুন্দরী।'* একদিন হঠাৎ বললেন,

* আমার কমবয়েস, ওরা সব বলত—বৌয়ের পা দুটি যেন পদ্মফুল। পা সুন্দর হলে ভাগ্যিও ভালো হয়, লক্ষ্মী উথলে ওঠে, লোকে বলে। কই, হাড়চামড়া রয়ে গেল, শুধু কপালটাই পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

'নাঃ—তুই খুব লক্ষ্মী মেয়ে, আর কোনোদিন তোকে কুচ্ছিৎ বলব না। বউকে বলে যাবো বিয়ের সময় তোকে কিছু ঢিবি-ঢাবা সোনা দেবে অখন।' ঢিবি-ঢাবা কেন শুধোতে বললেন— 'তা তোর তো বাপু নিরেস চেহারা, গরীবের বাড়ি পড়বি। আজ এটা কাল সেটা ফ্যাচাং লেগে থাকবে—আজ ছেলের কলেরা হবে, কাল বাড়ি বাঁধা পড়বে, তখন জড়াও গয়নার কেউ দাম দেবে না, তাছাড়া গয়না সুন্দর হলে বেচবার সময় ভারী কষ্ট হয়।' এইসব উৎপাত কেন হবে জিজ্ঞেস করতে বললেন— 'আমি কি অত জানি, না ওদের সঙ্গে কখনো মিশেচি। দূর থেকে শুনেচি কাঠ চেলানো, সাবাঙ্ ঠেঙানো, ভাত ফুটোনো এই সবই ওদের কাজ।'

অথচ মানুষটি ছিলেন নানা গুণের আধার। পুরোপুরি নিরক্ষর, কিন্তু অসামান্য স্মরণশক্তি ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে পন্ডিতদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলতেও দ্বিধা করতেন না। যেমন সহজে মানুষ পা ফেলে চলে তেমনি অক্লেশে মিল বজায় রেখে যে-কোনো বিষয়ে ছড়া আর গান বাঁধতে পারতেন। গাইবার গলা ছিল খুব ভালো। বিয়ের গান, বাসরের গান, ছেলে-ভুলোনো, ইঁদুরভায়া আর শেয়াল পন্ডিতের ছড়া, পালকি বেয়ারা আর ভিখারীর গান—সবই তাঁর মুখে শুনেছি। বহুকাল হয়ে গেছে তাই সব গানের সব লাইন মনে নেই। দু'টি মাত্র গান সম্পূর্ণ মনে আছে, অন্যগুলো দু-চার লাইন। ভারতচন্দ্র পড়বার ক্ষমতা ছিল না, তাই শুধু শুনে শুনে পঞ্চাশ অক্ষরের কালীস্তুতি মুখে মুখে বানিয়েছিলেন। গত দু'তিন বছরের গোলমালে সেসব সংগ্রহ চুলোয় গেছে। নিজের হাতে রান্না সম্ভবত কোনোদিনই করেননি, কিন্তু রান্নার তাগবাগ খুব জানতেন। সন্ধেবেলা ধুনো দেওয়া হচ্চে, দাসীকে বললেন— 'বউকে বল একটু জটামাংসী ফেলে দিক আগুনে।'

একদিন দিনের বেলা ভাতের পাতে প্রচুর ক্ষীর আর ল্যাংড়া আম খেয়েছিলেন। তাই মা রাতে আর ওঁকে লুচি দেননি। ভিজে মুগের ডাল মিছরি মাখন আর একটিমাত্র সন্দেশ। তাই দেখে বললেন, 'অ্যাঁ, লুচি দেয়নি ? খাবো কিগো !' মনের দুঃখে তাঁর গান এসে গেল—গান দু'টো অন্যত্র ছাপা হয়েছে, কিন্তু পিসিমার নাম তো নেই সেখানে— তাই আবার দিলুম :

বলি শুনো পরানের ভাজ দুখো দিও না
বিধবার বরাদ্দ লুচি কেড়ে নিও না
বিবাহে ছেরাদ্দে লুচি ভুঞ্জাইলে মুচি শুচি
কুলবধূ হয়ে ছি ছি ধর্ম ছেড়ো না।
পোড়ার মুখে লুচি চাঁদের কি দিব বাখানা—

দু'চারদিন বাদে গুরুজনেরা কেউ কেউ বললেন, 'দিদি, বেনাবনে জংলীদের সামনে মুক্তো ছড়ালেন ! নতুন গান শোনান।' পিসিমা বললেন, 'যেমন খাওয়াবে তেমন গান

হবে। একা তো খাবো না—ঘুরসুদ্দু কচুরি জিলিপি খাওয়াও দিকিনি।' তারপর তুড়ি দিতে দিতে গুন গুন ক'রে গান ধরলেন—

আহা, ঘৃতঝরা সুধাভরা কচুরিরো সহোদরা
ওগো, ফুলকো লুচি, ফুলের কুচি না দেখিলে চক্ষে বহে পানি।
হ্যাদে, সংসারো বৃক্ষেরো ফলো ক্রেমে ক্রেমে টলমলো
এখন কান ফোঁড়াব, যুগি হব, কুল তেজিব সঙ্গে নিব
জপের মালা, উঁহু, লুচির ঝোড়াখানি ॥

চুঁচড়োয় ভাড়া বাড়িতে থাকতে একবার পাড়ার কোন হারানবাবু (যাঁর ডাকনাম হারু) এফ. এ. পাস করেন। পিসিমারা দল বেঁধে গিয়ে গান ধরলেন—

শুনচি নাকি পাশ করেচে এল্‌এ-বিএতে
ওলো হারুর মা, আমাদের কি দিবি খেতে।
লিচু আর গোলাপি জাম বড় বড় ফজলি আম
জিভে গজা খেতে মজা রসোগোল্লা রসেতে ॥
যদি না দিবি খেতে তবে পড়িয়েছিলি কেন ছেলের এল্‌এ-বিএতে।
ওলো হারুর মা, আমাদের কি দিবি খেতে ॥

সধবাবেলায় চন্দননগরে থাকতে গঙ্গার ঘাটে বাঁধা ও গাওয়া একটি পদ্য শুনুন। পিসিমাদের নিজস্ব ঘাটে বেলা তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত মেয়েদের যাবার নিয়ম ছিল। ঐ সময় পুরুষেরা বড় কেউ আশপাশেও থাকতেন না। তাই মেয়েরা দিব্যি ঘোমটা আর চুল খুলে গল্প-গাছা করতেন, কেউ কেউ বাটি ভরে ব্যাসম কিংবা হলুদ-বাটা নিয়ে হাতে-পায়ে মাখতেন। একদিন ঘাটে যাবার পথে দেখেন তাঁর বন্ধু মানকুমারী ওরফে মানী ছুটতে ছুটতে ফিরে আসচেন। ক্ষীরোদা শুধোলেন— 'কিলা মানী, অমন হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে আসচিস কেন ?' মানকুমারী বললেন, 'দিদি, আমি সবে চুল এলিয়ে পা ছড়িয়ে বসেচি, অমনি তিন নৌকো ধনীর বাপ নৌকো চেপে এসে হাজির। তোমরা ভাই, কেউ নেই। যদি—আমাকে টেনে নে যায় তাই ব্যাসমের বাটি ফেলে রেখে ছুটে ছুটে ফিরে এলুম।'

এখন মানকুমারী বা মানীর মেয়ের নাম ধনী আর তাঁর স্বামীর নাম গোরা। তিন নৌকো গোরা সেপাই না বলে তিনি সোজাসুজি ধনীর বাপ বলে বোঝাতে গেছলেন। সেদিন আর ঘাটে যাওয়া হল না। পরদিন ক্ষীরোদার সঙ্গে গিয়ে আর পাঁচজন মিলে গাইলেন—

ধন্যি মেয়ে মানকুমারী ধন্যি মানি তাকে।
তিন নৌকো বোঝাই পতি কিসের গুণে রাখে ॥

এ-পদ্যটা আরো ছিল, মনে নেই।

মানকুমারীর গল্প শুনে সুকিন্দের মামা বললেন,— 'দিদির বেশ রসের গানটানও চলত দেখচি।' পিসিমা বললেন, 'দোহার দেবার মানুষ থাকে তো রসের ফোয়ারা ছোটানো যায় দাদা। এরা সব বড় গোমড়ামুখো, গান বোঝে না। তাতে বোয়ের কাছে গলা খুলে শুধু রাতে দু'টো পেসাদি শোনাই।' মামার সেকেলে গান খুব পছন্দ ছিল। হেসে বললেন,— 'দিনের বেলা খেউড় গেয়ে, পেসাদী গাও রাতে!' উনি শোনামাত্তর হাতে তালি দিতে দিতে গাইলেন— 'গঙ্গামরণ হরির চরণ তাতেও পাব হাতে।'

রোজ রাত্তিরে বারোটার পর তাঁকে গানে পেত। অজস্র রামপ্রসাদী গান তাঁর মুখস্থ ছিল। গান শুনতে শুনতে সারাদিনের পরে ক্লান্তিতে মায়ের ঘুম এসে যেত। খুব রাগ ক'রে তিনি মাকে গালমন্দ করতেন। বলতেন— 'সারাদিন চাষার বলদের মতো খাটতে পারে বৌটা। তোদের পিসে বলেছিল আমার গলায় টপ্পার দানা আছে, আর বউ বোঝে শুধু ঘোড়ার দানাপানি।'

এমন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে শুনে আমরা একবার তাঁকে পরীক্ষা করেছিলুম। তখন শ্রাবণের শেষ, ঘোর বর্ষা, ভিজতে ভিজতে গামছার পুঁটুলি হাতে দলেদলে মানুষ রাস্তা দিয়ে যাচ্চে—প্রশ্ন করি— 'বলুন তো পিসিমা, এরা ভিজতে-ভিজতে যাচ্চে কোথায়?' একটুখানি হেসে শুধোলেন— 'আজ কি বার গো?' আমরা সোমবার বলা-মাত্তর—তুড়ি দিয়ে বলে উঠলেন :

সোমবার শ্রাবণ মাস, শিবের নাম গেয়ে—।
পাপ ধোওসে মাগী মিনসে গঙ্গা পানে ধেয়ে॥

সুন্দর চেহারা রঙিন সাজপোশাক দুনিয়ার সুন্দর জিনিসের প্রতি পিসিমার গভীর মমতা ছিল। নিজের দুই মেয়ের নাম রেখেছিলেন অতসীপ্রভা, আর মালতীলতা, ছেলের নাম বসন্তকুমার। মেয়েদের ডাকনাম দেন আতা আর মালা। সোনার আতা আর দানার মালা। মুখোমুখি তাঁর সঙ্গে তর্ক করার দুঃসাধ্য সাহস কারো ছিল না। আড়ালে কিন্তু নিন্দের ঢেউ বইত। বিধবার মতো চাল নয়, বড় বেশি খাওয়ার ঝোঁক। অমন ঘটি ঘটি ঘানির তেল মাখলে আমাদেরও রঙের জেল্লা খুলত ইত্যাদি।

অনেক যাগযজ্ঞের পরে পিসিমার জন্ম, এটা সেকালের ঘটনা, আর সেই যজ্ঞের বেদীতে চণ্ডালের হাড় পাওয়া গেছল এটা রটনা। ওঁকে বাবার মৃত্যুর পরে শেষবার দেখি—সুর ক'রে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদছিলেন। বেশ খারাপ লেগেছিল। বুঝতে পারিনি যে ওটা সেকালের দস্তুর।

বাবা হঠাৎ চলে যেতে গোটা সংসারে তখন দারুণ ওলোট-পালোট। আমরা বিভ্রান্ত। পিসিমার আর খবর নিতে পারিনি। ঠিকানাও রাখিনি। বিস্মৃত ক্ষীরোদবাসিনীকে আজ আমার কুণ্ঠিত প্রণাম জানাই।

'বেম্মা-ঠেকানো'

অধ্যাপিকা লতিকা ঘোষের দেওয়া এই কাহিনীটি। তাঁর মা শ্রীমতী শৈলবালা তাঁর দিদিশাশুড়ি ভুবনমোহিনীর গল্প তাঁকে এভাবেই বলেন।

আমার দাদাশ্বশুর পালকি চেপে মহালে যাচ্ছিলেন—পথে কোথায় যেন বেয়ারারা জল খেতে থামলে দাদাশ্বশুর গাড়ি থেকে নেমে একটু এদিক-ওদিক করতেই দেখেন কিনা এক সাকারা সুন্দরী মেয়ে বাঁ হাতে গোবরের তাল নিয়ে ডান হাতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেওয়ালে ঘুঁটে দিচ্চে। ঠাকুর্দা মশাই তখুনি গিয়ে সেই মেয়ের নামধাম জিগ্যেস করলেন। যেই দেখলেন স্বজাতের মেয়ে, তাঁদের পালটি ঘর, অমনি মেয়েকে নিয়ে সোজা গেলেন তার বাপের কাছে। বয়েসের অনেক তফাত, তাই গরিব হলেও মেয়ের বাবা দোনামোনা করতে লাগলেন। তখন ঠাকুর্দা স্পষ্ট ক'রে বললেন,— 'না, ওর সতীন হবে না, আমার দ্বিতীয় পক্ষ গত হয়েচেন। তাঁর সন্তান ছিল না। এখন আপনার মেয়ের ছেলে জন্মালে সব সম্পত্তি সে-ই পাবে।' বলার সঙ্গে যেই নিজের বার্ষিক আয় উল্লেখ করলেন, অমনি মেয়ের বাপ রাজি হয়ে গেলেন। শুধু শাঁখা আর সিঁদুর পরিয়ে বৌ নিয়ে সে-যাত্রা ঠাকুর্দা ঘরে ফিরে এলেন।

গরিবের ঘরের ছোট মেয়ে প্রচুর আদরে ধীরেসুস্থে থিতু হয়ে গিন্নি হয়ে বসলেন। স্বামীর প্রতিজ্ঞার কথা তাঁর মনে ছিল। তাই ছেলে হবার পরে একরকম অল্প বয়েসেই তার বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আনলেন। ছেলের বৌ ঘরে আনার পর থেকে ঠাকুর্দার শরীর ভাঙতে লাগল। একদিন তিনি তাঁর ছেলেকে ডেকে আনিয়ে বললেন— 'দেখ, আমার যাবার সময় হয়েচে, সব সম্পত্তি তোমাকেই দোব, তবে তুমি আমার কথা রেখ, তাহলে আমার আশীর্বাদও পাবে। তোমাদের মাকে আমি খুব ছোটটি ঘরে এনেছিলুম, ও বিধবা হলেও মাছ খেতে দিও, বন্ধ কোরো না। আমি নিজে শখ ক'রে ওকে তামাক ধরিয়েছিলুম, তামাকটি দু'বেলা খাবে—ছাড়তে পারবে না। এতে তোমার কোনো পাপ হবে না, তুমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করবে। বৌমাকে বোলো পাড়া-পড়শি যাতে জানতে না পারে সেটা দেখবে।'

ঠাকুর্দা চোখ বুজলেন। শ্বশুরমশাই এই ভয়ংকর পিতৃ-আজ্ঞা পালনের সব দায়িত্ব আমার শাশুড়ির ওপর ছেড়ে দিলেন। শাশুড়ি খুব সাবধানে আর যত্নে দুই ভীষণ কাণ্ডই চালিয়ে যেতে লাগলেন। কাকপক্ষীতে টের পেল না। শাশুড়ির মেয়ে ছিল না, আমি তাঁর প্রথম ছেলের বৌ, আমাকে যত্ন করতেন, ভালোও বাসতেন। কাজকর্ম তাঁর কাছেই সব শিখলুম। রাঁধাবাড়া সব আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেও ঠাকুমাকে খেতে দেওয়া আর তাঁর বাসন মাজা নিজেই করতেন। আমাকে বলতেন— 'তুমি ও-তল্লাটে যেও না।' আমার মন খুঁৎ খুঁৎ করলেও শাশুড়ির কথার অবাধ্য হইনি বা তাঁর সঙ্গে তর্ক করিনি। হঠাৎ একদিন মনের ভুলে, মানে পুরোপুরি বে-খেয়ালে,

লম্বা গলি পেরিয়ে দিদিশাশুড়ির ঘরে গিয়ে উপস্থিত। দোর বন্ধ ছিল না। শাশুড়ি বেশ রাগ করেই বললেন— 'তুমি নাচতে নাচতে এ-ঘরে এলে কেন ? তোমাকে না বারণ করা হয়েছিল!' দিদিশাশুড়ি তখন মাছের মুড়ো চুষচেন, গোটা পাত মাছের ঝোলে মাখামাখি।

এমন কাণ্ড আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। সত্যি আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললুম। তারপর কোনোরকমে সামলে বললুম, 'ইচ্ছে ক'রে আসিনি মা, তোমার পা ছুঁয়ে সত্যি বলচি। গলির মধ্যে ছুটোছুটি করছিলুম, মনের ভুলে এসে পড়েচি।'

আমাকে ক্রমাগত কাঁদতে দেখে দিদিশাশুড়ির দয়া হল। তিনি বললেন— 'দেখেচে ত, বড় বয়ে গেচে—ঘরের বৌ ত পর নয়। তুমি বরং এখন থেকে আমাকে খাওয়ানোর ভার নাতবোয়ের ওপর ছেড়ে দাও।' খুব সহজে বিনা অশান্তিতে ব্যাপার চুকে গেল।

দিদিশাশুড়ি খুব আমুদে মানুষ ছিলেন। নাতবোয়ের সঙ্গে এতদিন শুধু রঙ্গরসিকতা চলত, এখন কোনো পর্দাই রইল না। নিজের তামাকের অভ্যেসের কথা নিজেই বললেন, লজ্জা-সংকোচের কোনো বালাই তাঁর ছিল না। সোজাসুজি ডেকে মুখে মুখে তামাক সাজতে শেখালেন। কল্কের মুখে রিঠের বিচির মতো কি একটা পুরে তামাকের গুলি দিয়ে সাজিয়ে টিকে সাজানোর পর আগুন দিয়ে ফুঁ দিতে দিতে ঠাকুমার গড়গড়ার ওপর বসিয়ে দিতুম। এতেও পালা সাঙ্গ হতো না। বিকেল চারটেয় গা ধুতে যাবার আগে ঐ লম্বা গলির এঁটো কুলুঙ্গি থেকে একটা টিনের লম্প ঠাকুমার ঘরের সামনে এনে জ্বেলে তাঁকে দেখিয়ে গোটাকতক টিকে এনে ঐ লম্পের আগুনে সামান্য ঠেকিয়ে, মাটির সরায় রেখে তবে কাপড় কাচতে যেতে পেতুম। এই কাজটার নাম ছিল 'বেম্মা-ঠেকানো'।

কিছুদিন যাবার পরে ভরসা ক'রে একদিন জিগ্যেস করলুম— 'হ্যাঁ ঠাকুমা, টিকেতে কেন আগুন ছোঁয়াতে হয় ?' ঠাকুমা বললেন,— 'ওমা, তা জানিসনি, মুসলমানের ঘরে ঝি-বৌরা কয়লার মিহি গুঁড়োতে ভাতের মাড় মেখে ওগুলো তৈরি করে। ভেন্ন জাতের ভাতের ছোঁয়া পড়লে বিধবা মানুষকে সাবধান হতে হবে না ?' 'সে না হয় হল, বেম্মা কোত্থেকে এল ?' 'ওমা, তুই কি হাবা মেয়ে রে, আগুনেই যে বেম্মা থাকেন। নতুন বাসন-কোসন সবই ত বেম্মা ঠেকিয়ে নেয়।'

'আচ্ছা, সে না হয় হল, কুলুঙ্গিতে তো ভাতের ছোঁয়া পড়ে না, সেটা কেন এঁটো হবে ?' ঠাকুমা বললেন— 'বাসন-মাজুনীরা এঁটো কাপড়ে লম্প নিয়ে যায় আসে। ধোয়াধুয়িতে লম্প থাকে কখনো ? বাইরেটা ধুলেও ভেতরে সুতোর পলতে তো ধোওয়া যায় না, তাই এঁটো।' আমি বললুম— 'লম্পর মাথায় দপ দপ ক'রে বেম্মা জ্বলতে থাকে আর তবু লম্প কেন শুদ্ধু হয় না ?' ঠাকুমা বললেন— 'নাতবোয়ের আমার নবীন বয়েস কিনা— খালি জিগ্যেসা, খালি তক্কো। মানবার কথা মেনে যাবি, না তক্কোর ঝুড়ি খুলে বসলি। যেমন ময়লা হলেও শুদ্ধ কাপড় শুদ্ধই থাকে তেমনি মাজা হলেও এঁটো লম্প এঁটোই থাকে।' এই গেল এক পর্ব।

আচার বিচার নিয়ে কত কাণ্ড যে করতেন, শাশুড়ি কেমন মেনে নিয়েছিলেন, তার একটি গল্পই বলি।

আমাদের ভেতরবাড়িতে একটা বড় পুকুরে আমরা মেয়ে-বৌরা গল্পগুজব ক'রে গা ধুতুম। শাশুড়ি বলে দিয়েছিলেন— 'ঠাকরুণ জলে থাকলে তোমরা যেও না, ওঁর ছোঁয়া পড়বে।' একদিন মাথা বাঁধতে দেরি হয়েচে, পড়ন্ত বেলায় গিয়ে দেখি ঠাকুমা জলে। চট্ ক'রে পালিয়ে এলুম। ওমা! ঠাকুমা হেঁকে বললেন— 'শোন্, এদিকে আয়। মাথা ভিজিয়ে ডুব দে। আমি পষ্ট দেখলুম—কালীদাসী চলে গেল আর তুই তার পায়ের ছাপে ছাপে পা দিয়ে উঠে গেলি। কালীর ছোঁওয়া পড়ল না?'

কত যত্ন ক'রে মা মস্তবড় খোঁপা ক'রে দিয়েচেন, কি ক'রে মাথা ভেজাই? আমি ছুটে শাশুড়ির কাছে গেলুম। সব কথা শুনে আমার ওপর রাগ না করেও বললেন— 'এখন আমাকেই ভুগতে হবে, দেখি কী হয়।' ঘাটে যেতেই দিদিশাশুড়ি হায় হায় করতে লাগলেন— 'আদুরে বৌকে তুমি মাথায় তুলেচ, বিছানাপত্তর ছিষ্টি এঁটো করবে।' শাশুড়ি বললেন— 'মা, শীতের বেলায় ডুব দিলে যদি জ্বর-জাড়ি হয়, পরের মেয়ে, তায় ঠাণ্ডার ধাত, ওকে বিছানায় শুতে দোব না, কম্বল পেতে মাটিতে শোবে, গায়ে লেপ দোব না—কম্বলই দোব। আলগা আলগা থাকবে, হেঁসেলে যাবে না। কাল সকালে কম্বল রোদে দিলেই তোমাদের "বেম্মা-ঠেকানো" হয়ে যাবে।'

ঠাকুমা ঐ কথার ওপর আর কিছু বলতে পারেননি। বাবার ঠাকুমার নাম ছিল ভুবনমোহিনী। তাঁর এই বেম্মা-ঠেকানোর মোহন পন্থাটি সমাজপতিরা পরীক্ষা করলে কত সমস্যার সমাধানই না হয়ে যেত!

এক্ষণ, শারদীয় ১৪০০

সতীদাহের গল্প

ষাট বছর আগে একান্নবর্তী হিন্দু পরিবারে কালীপুজোব আগের দিনে ভূতচতুর্দশী তিথিটি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হতো। মেয়েরা কেউ উপোস করতেন, কেউ বা নিরামিষ খেতেন। সব নিয়ম মনেও নেই, তবে বাড়িতে মাছ-মাংস খাওয়া হতো না। ছোটবড় সবাই দিনের বেলায় চোদ্দ শাকভাজা খেতেন। আর সন্ধ্যা পড়তেই মাটির প্রদীপে তেল সলতে দিয়ে তুলসীতলা থেকে শুরু করে ঘরদোরে স্থানে অস্থানে সর্বত্র অন্ধকার, উপদ্রব আর ভূত তাড়ানো হতো। আমাদের ছেলেবেলায় ঐরকম প্রদীপ সাজিয়ে আমরা খুব আমোদ করতুম, অগ্নিকাণ্ড সামলানোর জন্যে সঙ্গে থাকত বাড়ির কোনো পুরনো দাসী। চোদ্দটি প্রদীপকে একত্রে জ্বলতে দেখলে গিন্নিরা সকলেই হাত বাড়িয়ে আগুনের তাপটুকু কপালে ঠেকাতেন। দৈবাৎ আমাদের মা সামনে এলে নমস্কার করে বলতেন 'শিবানী মা, শিবরানী মা, কাত্যায়নী মা, দাক্ষায়ণী মা' ইত্যাদি। কেন এমন বলছেন জানতে চাইলে, মা চুপ করেই থাকতেন। আর দাসী বলত, 'ওগো, তোমাদের বাড়ির আগুনখাগীদের সব নাম করছে মা-ঠাকরুণ। চল চল কাজ বয়ে যায়।' আগুন-খাগী শব্দটির উচ্চারণে আমাদের মনে অজানা ভয়ের সঞ্চার হতো, আমরা কাজটা চটপট সেরে ফেলতুম—বাজি পোড়াবার তাড়াও তো ছিল।

আগুন-খাগী শব্দের অর্থ যে সতী, তা জানতাম। কিন্তু ইতিহাসের পাতার সেইসব সতীদের সঙ্গে আমাদের যে কী সম্বন্ধ থাকতে পারে, তা বুঝতে পারতুম না। অনেকদিন ধরে মাকে জিজ্ঞাসা করলে, মা একটু একটু করে বলেছিলেন সেই কাহিনী— 'দেড়শো দুশো বছর আগে আমার দাদাশ্বশুরের দুই মা দেবানন্দপুরে বালির শ্মশানে, আর তাঁর দুই মামী বাঁশবেড়ে গ্রামে মানে ত্রিবেণীর শ্মশানে সতী হন।' মার দাদাশ্বশুর অর্থাৎ আমাদের প্রপিতামহ ঈশ্বরচন্দ্র যখন পিতৃহীন হন, তখন তাঁর বয়স পাঁচ-সাত বছর। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ছিলেন বৈদ্যনাথ। আমার পিতামহ চণ্ডীচরণ দত্তমুন্সী প্রায় শেষ বয়সে যখন পিতৃকৃত্য করতে গয়া হয়ে বৈদ্যনাথধামে যান, সেখানে পাণ্ডা রামপ্রসাদের কাছে ক্রিয়াকর্ম করিয়ে পিতা ঈশ্বরচন্দ্র, পিতামহ বৈদ্যনাথ এবং তারও উর্ধ্বতন তিনপুরুষের নাম স্বহস্তে লিখেছিলেন। কিছু মন্তব্যও ছিল। বি.এ. পরীক্ষা দেবার পরে ১৯৪৬ সালে আমি ওখানে গিয়ে নিজের চোখে তা দেখেছিলাম। কিন্তু লিখে নেওয়ার সরঞ্জাম ছিল না, টাকাপয়সাও না, তাই সপ্রমাণ সব কথা আজ বলতে পারি না। শুনেছি বৈদ্যনাথের দুটি নাম ছিল, কোনো সন্ন্যাসীর কথায় তাঁর অল্পায়ু ঘোচাতে নাম বদলানো হয়েছিল।

কিন্তু অকালমৃত্যু এড়ানো যায়নি। দত্তমুন্সীদের বৃহৎ বংশ-তালিকায় বৈদ্যনাথের কোন্ নামটি আছে তাও আমি সঠিক বলতে পারি না। পাণ্ডা রামপ্রসাদ কানাইলালের বংশানুক্রমে রক্ষিত তীর্থযাত্রীর খাতায় বিস্তর খোঁজ করে ব্যর্থ হয়েছি।

সেই ছেলেবেলায় মার মুখে শুনেছিলুম, বৈদ্যনাথ যখন মারা যান, তখন পাঁচ-সাত বছরের অনাথ ঈশ্বরচন্দ্র পিতা এবং দুই মাতার মুখাগ্নি করে বাড়ি ফিরে আতঙ্কে বারবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলেন। ওইটুকু ছেলেকে রেখে (শুনেছি ঈশ্বরচন্দ্র একান্ত সুদর্শনও ছিলেন) মায়েরা কেন সহমরণে গেলেন, ভাবতে প্রায় অবিশ্বাস্য লাগে। বৈদ্যনাথ দত্তমুন্সীদের শরিক জমিদার, যথেষ্ট ভূসম্পত্তি তাঁর ছিল বলে শুনেছি। সহমরণের সংকল্পবার্তা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে যায়। চুঁচুড়া, চন্দননগর এমন-কী শ্রীরামপুর-মাহেশ থেকেও আত্মীয়েরা পাল্কি চেপে দেখতে আসেন। রক্তবস্ত্রে, সিঁদুরে, শাঁখায়, ফুলে, মালায় সাজানো দুই সতীকে মহা আড়ম্বরে দেবানন্দপুর বালির শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। মায়েদের পুণ্যার্জনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বালক ঈশ্বরচন্দ্র যখন ভীত, সন্ত্রস্ত, অসুস্থ—গ্রামের আত্মীয় পরিজন কেউ সেই নাবালকের দায়িত্ব নিতে রাজি হলেন না। তখন ঈশ্বরের মামা তাঁকে স্বগ্রাম বংশবাটীতে নিয়ে গেলেন। মামার সম্পত্তি ছিল, কিন্তু উত্তরাধিকারী ছিল না।

ঈশ্বরচন্দ্রের মামা নাকি ত্রিবেণী অঞ্চলের বিশিষ্ট বিদ্বান ছিলেন। ঈশ্বরকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহে পালন করেছিলেন। চারবছরে মামার কাছে ঈশ্বর লেখাপড়াও বেশ কিছু শুরু করেছিলেন বলে মা'র মুখে শুনেছি। কিন্তু এমনই কপাল ঈশ্বরের যে, সেই মামাও চারবছরের বেশি রইলেন না। ঈশ্বরকে আবার মুখাগ্নি করতে হল, এবারে মামার, সঙ্গে নাকি দুই মামী সতী হলেন। সম্ভবত তাঁরা দু'জন দাক্ষায়ণী আর কাত্যায়নী, আর মায়েরা দুজন ছিলেন শিবানী আর শিবরানী। সতীর সিঁদুর আর পায়ের ছাপ দেশের বাড়িতে কোনো বাক্সে নাকি রাখা ছিল। আমার মা অবশ্য তা কখনও দেখেননি। কিন্তু মা শুনেছেন যে, বাঁশবেড়ে গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের মামার খুব ভালো একখানা পাকা দোতলা বাড়ি ছিল। বাড়ির কর্তার মৃত্যু, গিন্নিদের সহমরণের পরে সে বাড়িতে কে ছিল কে জানে। মোট কথা, ত্রিবেণীর শ্মশানে বালক ঈশ্বর মামার মুখাগ্নির পরে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লেন, তবু বাড়ি থেকে কেউ তাঁকে নিতে এল না। শেষে একদল সন্ন্যাসী নাকি তাঁকে ভুলিয়ে নিজেদের দলে নিয়ে যায়।

সন্নিসীসঙ্গে বারো বছর ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। তারপর সন্নিসী-ঠাকুর নিজের গুরুর দেখা পেলেন। সেই গুরু ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখামাত্র নাকি বলেছিলেন, এত ভালো ছেলে নিয়ে আমাদের কী হবে? এ ছেলের তো সংসার হবে, সন্তান হবে। শিষ্যকে তিনি নির্দেশ দিলেন, এই মুহূর্তে ঈশ্বরকে ত্যাগ করতে। গুরুর আদেশ ফেলবার নয়। তাই সন্নিসী-ঠাকুর কিছু টাকা আর সুতোর ঝোলায় একটি বাণলিঙ্গ শিব দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে বিদায় দিলেন। গল্প বলতে বলতে মা বলেছিলেন, 'আমাদের এই শিব এখনও পুজো পাচ্ছেন, এরপর কী হবে, জানি না।'

সন্নিসী-ঠাকুর যখন ঈশ্বরচন্দ্রকে ত্যাগ করেন, তার আন্দাজ দেড়বছর পরে পায়ে হেঁটে, মালের নৌকো চেপে ঈশ্বর প্রথমে ত্রিবেণীতে পৌঁছলেন। মামার বাড়িঘর দখল করে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কিছুই ছেড়ে দিতে নারাজ। তখন ঈশ্বর এলেন দেবানন্দপুরে। হুগলী জেলায় সপ্তগ্রামের খুব কাছে সরস্বতী নদীর পূর্বকূলে এই গ্রাম। সেই সরস্বতী নদী, যার সঙ্গে মিশে আছে পর্তুগীজদের নৌযুদ্ধের ইতিহাস। সেই দেবানন্দপুর, যেখান থেকে প্রায় শিশু অনাথ ঈশ্বরচন্দ্রকে মামা একদিন নিয়ে গিয়েছিলেন। গাঁয়ে ফিরে ঈশ্বরচন্দ্র দেখেন, জমি-জমা, বাগান-পুকুর, সবই বড় জমিদার দত্তমুন্সীদের দখলে। ভিটের চারপাশে অপরিচিত অজানা সব লোকজন ঘর তুলে বসতি করছে। মুন্সীবাবুরা জমিজমা কিছু ফিরিয়ে দিলেন না ঈশ্বরকে, তবে ভাঙাচোরা ভিটেতে ঘর তুলে দিলেন, যাতে গ্রামে বাস করতে পারেন ঈশ্বর। লেখাপড়া নাকি ভালো জানতেন ঈশ্বরচন্দ্র। মামা কিছু শিখিয়েছিলেন বাল্যের শুরুতে। তারপর সন্নিসীদের কাছে থাকতে থাকতে কিছু শাস্তর, সেলাই, টোটকা চিকিৎসা, এসব নাকি শিখেছিলেন। ইংরাজি লিখতে-পড়তে কোথায় শিখলেন, তা বলতে পারব না। কিন্তু মায়ের মুখে শুনেছিলাম, ওই জানার সুবাদে ঈশ্বর হুগলী শহরে পোস্ট-অফিস না কোথায় যে ভালো চাকরি পেলেন। তিনি নাকি বলতেন, সম্পত্তিতে তাঁর প্রয়োজন নেই, কিন্তু সংসার করতে হবে, তাই সে সংসার চালাতেও হবে, বংশরক্ষা করতে হবে, এ তাঁর গুরুর আদেশ। মুন্সীবাবুদের জমিদারবাড়িতে আশ্রিতা ছিলেন এক স্বজাতি কায়স্থ মহিলা, দুধ জ্বাল দেওয়ার কাজ করতেন। তাঁর মেয়ে কেনামণির সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাহ হয়। আমার পিতামহ চণ্ডীচরণ কেনামণি দাসীর নামে অনেকগুলি বাগান কিনেছিলেন পরে—দীঘির বাগান, কলমের বাগান, চারা বাগান, কেশেপড়া, ডুবির ভুঁই, হাড়িপাড়া, মুচিপাড়া—এমন কয়েকটি নামের হদিশ করতে পেরেছি।

মা বলেছিলেন, 'দাদাশ্বশুরের সাতাশ-আটাশ বছর বয়সে আমার শ্বশুর মহাশয়ের জন্ম। শ্বশুরমশাই বেঁচেছিলেন ষাট বছর, এসব কথা অনেকবার আমি শুনেছি, তোমাদের বাবার ডায়েরিতেও এসব কথা লেখা থাকবে হয়তো। প্রত্যেক বছর কার্তিক মাসের ভূতচতুর্দশী, ফাল্গুন মাসের শিবচতুর্দশী আর চৈত্রে চড়কের সময় আমাদের বাড়িতে ত্রিবেণী থেকে আসত সব সন্নিসীরা। তারা আমাদের এই বাণলিঙ্গকে তামার টাটে চড়িয়ে গান করত, হল্লা করত, নাচত। অনেকক্ষণ নাচার পরে সামনের মাঠে বসে তারা গাঁজা খেত। তোমার ঠাকুমার আমল পর্যন্ত এসব আমি দেখেছি। এইসব উপলক্ষে আমাদের বাড়িতে চৌদ্দ প্রদীপের সঙ্গে আরও চার প্রদীপ অর্থাৎ আঠারো প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হতো। তোমাদের ঠাকুমার কথামতো আমি ঐসব দিনে ফলটল খেয়ে থাকতুম আর "শিবানী মা, শিবরানী মা, কাত্যায়নী মা, দাক্ষায়ণী মা"— এইসব জোরে জোরে চোদ্দবার বলতুম। শাশুড়ি বলতেন, তাঁরা স্বামীর চিতায় দেহ দিয়ে শিবলোকে গিয়ে সতী হয়ে আছেন, তাঁদের নামে বাতি দিলে সংসারের কল্যাণ হবে। তবে ওই সন্নিসীদের আসা যে কবে থেকে শুরু হয়েছিল, কেনই বা শুরু হয়েছিল, এসব আমি বলতে পারব

না।' জিজ্ঞাসা করেছিলাম, শিবানী, শিবরানী—এসব কি সত্যিই সতীদের নাম ? মা বলেছিলেন, 'সতীদের নাম কে আর লিখে রেখেছিল বল ? তবে শুনেছি, আমার দাদাশ্বশুর নাকি জপ আহ্নিক শেষ হলে প্রত্যেকদিন সকালে সন্ধ্যায় শিবানী মা, শিবরানী মা বলতেন খুব জোরে জোরে। ছেলের জন্মের পর থেকে সংসারে তো তেমন মন ছিল না। যেন বংশরক্ষা হয়েছে, গুরুর আদেশ পালন হয়েছে, আর সংসারী জীবনের কী মানে, এমনই ভাব। আমার দিদিশাশুড়ির জীবন তাই খুব সুখে কাটেনি। তিনি অন্তর্জলী যাত্রা করেছিলেন, শুনেছি। তবে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে, আবার সে-যাত্রা থেকে বাড়ি ফিরে আসেন। আর তিনি ফিরে আসার দেড় দিনের মধ্যে নাকি আমার দাদাশ্বশুর, দিব্যি সুস্থ মানুষ, হঠাৎই গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করলেন। জানি না, জপ আহ্নিকের শেষে দাদাশ্বশুর যে শিবানী মা, শিবরানী মাকে ডাকতেন, তা তাঁর সতীমায়েদের নাম ধরে ডাকতেন, নাকি ওসব তো দুর্গারও নাম, সেই দুর্গানামই করতেন।'

মায়ের মুখে এই কাহিনী শোনবার পরই আমি কাকাদের কাছে, জ্ঞাতিদের কাছে খোঁজ নিই। ১৯৫২-৫৩ সালে দেবানন্দপুর গ্রামেও গিয়েছিলাম। আমাদের ভিটেবাড়ি পড়ে গিয়ে অশথ-বটে জড়িয়ে সে এক ধ্বংসস্তূপ যেন! বহু কষ্টে, দু'বছরের চেষ্টায় দু'খানিমাত্র ঘর মেরামত করতে গিয়ে আমার নিজস্ব উপার্জন সমস্ত শেষ হয়ে গেল। আমার প্রপিতামহের রুদ্রাক্ষমালা, গানের খাতা, পিতামহের ডায়েরি, রোমান হরফে হিন্দুস্থানী ভাষায় ছাপা ছেঁড়া বাইবেল, বিস্তর চিঠিপত্র, জমিদারির কিছু নথিপত্র খুঁজে পেয়েছিলাম। বাড়িতে দু'খানা বড় কাঠের সিন্দুকে এগুলো থাকত। সে বাড়ি জবরদখল করে যাঁরা এখন আছেন, শুনেছি তাঁরা সবই ফেলে দিয়েছেন। গ্রামের অবস্থা, দেখেছিলুম, খুবই শোচনীয়। মন্দির, দোলমণ্ড, নাটবাংলা, সবই ভাঙা। এটর্নি শৈলেন মিত্তিরের কুল-পুরোহিত বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের পোড়ো বাড়িকে আগুন-খাগীদের ভিটে বলা হতো, আর কিছু জানিনে।' প্রবীণ প্রতিবেশী দাশু ঘোষ মশাইকে নিয়ে মন্দিরে, আখড়ায়, পাটবাড়িতে, শ্মশানে গিয়েছি, কিন্তু শিবানী মা, শিবরানী মা'র বিস্তারিত খবর কিছুই পাইনি। 'সতী হয়েছিল,' এইটুকুও বলতে পেরেছিলেন গ্রামে মাত্র দু'জন। তাঁরা বরং আমার পিতামহের সম্পত্তি অর্জনের গল্প শোনাতে অনেক বেশি আগ্রহী।

আমার পিতামহ চণ্ডীচরণ নাকি কুড়ি বছর বয়স হওয়ার আগে থেকেই নানান কাজ করেছেন । হাজারিবাগ থেকে রাঁচির রাস্তা তৈরির কাজে তিনি নাকি ছিলেন কনট্র্যাক্টর। ইংরেজ-প্রীতি খুব বেশি ছিল তাঁর। মিউটিনির সময় দুটি ইংরেজ পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তিনজন সাহেবের দেওয়া সার্টিফিকেট তাঁর ছিল! আর একটা গল্প শুনেছি যে, পিতা ঈশ্বরচন্দ্র নাকি পুত্র চণ্ডীচরণের লেখাপড়ার ব্যাপারে একটা কথাই বলতেন যে ইংরাজিও শিখতে হবে, ফার্সিও শিখতে হবে। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে ফার্সি জানতেন বলে যে কথার প্রচলন আমাদের বাড়িতে ছিল, তা সত্যি কিনা

আমি জানি না। একথা ঠিক যে, চণ্ডীচরণ দত্তমুন্সী সম্পত্তি বেশ করেছিলেন, কয়েক' শো বিঘে ধানের জমি তাঁর বেনামে ছিল, বাগানগুলির কথা তো আগেই বলেছি। চণ্ডীচরণ গ্রামে ফিরে আসেন জীবনের শেষের দিকে. কর্মসূত্রে বেশিদিন উত্তর-বিহারেই কাটিয়েছেন।

শুনেছি, দেবানন্দপুরে, দিনের বেলা স্নান সেরে উঠে হঠাৎই সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। আমার বাবা-কাকারা, গ্রামের আরও কেউ কেউ সে সময় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৮৯০ সালে, তখন তাঁর বয়স ছিল ষাট। তাই তাঁর জন্মের বছরটি ১৮৩০ ধরলে ভুল হবে না। এইভাবে মায়ের মুখে শোনা গল্প ধরে পিছিয়ে পিছিয়ে শিবানী, শিবরানীর সতী হওয়ার আনুমানিক সময়কাল একটা নির্ধারণ করা যায়। ঈশ্বরচন্দ্রের সাতাশ-আটাশ বছর বয়সে যদি চণ্ডীচরণের জন্ম হয়ে থাকে, তবে কি ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের বছরটি ১৮০২-৩ নাগাদ ধরা যায় ? বৈদ্যনাথের মৃত্যুর সময় ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন পাঁচ-সাত বছরের বালক, একথা মায়ের মুখে শুনেছি। তাই ধরা যায় শিবানী, শিবরানীর সহমরণ সংকল্পের সময়টা ছিল গত শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষের দিকে। তারও চারবছর পরে ঈশ্বরচন্দ্রের মামার মৃত্যু। সুতরাং দাক্ষায়ণী, কাত্যায়নী সতী হয়েছিলেন উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রথম দিকে।

কোনো লিখিত নথিই আমার কাছে নেই। মায়ের মুখে শোনা সেই আগুন-খাগীদের রহস্যমোচনের গল্পেই নির্ভর। তবে রহস্য আর কীই বা কাটল ? যৎসামান্য সম্পত্তির মালিকানা যদি বিধবাদের থাকত, তখনই কি তাঁদের অভিভাবকহীনতার সুযোগ নিয়ে সতীদাহে সম্মত করানো হতো ? সতীদাহ প্রসঙ্গে সামান্যতম লেখাপড়া বা আলোচনা যাঁরা করেছেন, তাঁরাও মানবেন যে, উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকে হাওড়া, হুগলী, কাটোয়া, বর্ধমান অঞ্চলে সতীদাহের সংখ্যা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মায়ের মুখের গল্প থেকে যা অনুমান হয়, ঈশ্বরচন্দ্র মারা গেছেন ১৮৫০ নাগাদ। তারও বহু আগে, সেই যখন গুরুর আদেশে সন্নিসী ঈশ্বরকে ত্যাগ করেন, সেই ১৮২৪-২৫ নাগাদ বাণলিঙ্গ শিব আমাদের পরিবারে এসেছিলেন। মায়ের চিন্তা ছিল, তাঁর উত্তরপুরুষদের জমানায় এতদিনের শিবঠাকুরের পূজার কী হবে। শিবেন্দ্রনারায়ণ ঘোষালের *বাঙ্গালার পারিবারিক ইতিহাস* বইটিতে একটি সংক্ষিপ্ত বংশলতিকায় দেখেছিলুম, দত্তমুন্সীদের আদি পুরুষ কামদেব মুন্সী আর কল্যাণদাস থেকে আমার বাবা দাশরথি দত্ত পঞ্চম পুরুষ। ষষ্ঠ পুরুষের জমানাতেও আমি রোজ সাধ্যমতো তৃতীয় পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্রের পাওয়া বাণলিঙ্গ শিবকে জল দিই। তবে শিবঠাকুরের ভবিষ্যৎ আমার জানা নেই, যেমন জানা নেই শিবানী-শিবরানী-দাক্ষায়ণী-কাত্যায়নী মায়েদের অতীতের ভিতরকার আসল কাহিনীটা।

বারোমাস, শারদীয় ১৯৯৩

মাতৃভক্তি

আমাদের এক অধ্যাপক প্রায়ই বলতেন বাঙালি প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসপ্রবণ জাত। স্বপ্ন দিয়ে তৈরি আর ভক্তি দিয়ে মোড়া। তারপর আউড়ে যেতেন— 'ক্ষমা শব্দটি এত সুন্দর কেন জানেন,—মা শব্দটি উহাতে আছে বলিয়াই উহা এত পবিত্র ও মধুর।'

তাঁর কথাটা মনে থেকে গিয়েছে। মানুষকে ভালোবাসা আর ভক্তি করার অর্থ এই নয় যে তাঁদের সমস্ত অনুচিত বাক্য বা অন্যায় অনুরোধ রক্ষা করতে হবে। কয়েকজন বৃহৎ ব্যক্তির জীবনে দেখেছি এই ভক্তি ঔচিত্যের সীমা লঙ্ঘন করে গেছে, কোনো অভিযোগ কোনো দ্বন্দ্ব বা প্রতিবাদের চিহ্ন তাঁরা রেখে যাননি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি তাঁর জীবনে একটি আলোকস্তম্ভের মতো। ভগবতী দেবীই ঈশ্বরচন্দ্রকে বহু যত্নে এমন কারুণ্য আর কোমলতায় মণ্ডিত করেছিলেন বলে শোনা যায়। কথাটি অসত্য নয়। কিন্তু পুত্রবধূ দিনময়ী দেবীর কোনো স্থান ঐ বৃহৎ সংসারে ছিল না। রান্না আর ভাঁড়ার, যেখানে মেয়েদের জীবন কেটে যেত বলা চলে সেখানে তিনি আজ্ঞাবাহী মাত্র ছিলেন। তরকারি কুটতেন, মানে আলু-পটলের খোসা ছাড়াতেন—সেগুলো ডুমো-ডুমো হবে না ফালি-ফালি হবে, তা ভগবতী বলে দিতেন। থোড় আর মোচা দুটোর কোনটা রান্না হবে তাও তিনি এসে নিজে স্থির করতেন। এইসব সংসারের তুচ্ছ খুঁটিনাটি বিদ্যাসাগরের পালিতা কন্যা শিবমোহিনীর মুখে আমরা বহুবার শুনেছি। যে বিদ্যাসাগর দেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের প্রাণপুরুষ ছিলেন তাঁর নিজের ঘরেই তো ছিল প্রদীপের নিচে অন্ধকার! এ ব্যাপারে একটা সত্য ঘটনা বলি।

বর্ধমান জেলার জৌগ্রামের মজুমদার বাড়িতে বড় আর ছোট তরফের মধ্যে ছিল দীর্ঘকালের শরিকানী বিবাদ—কখনো মাছধরা, কখনো-বা প্রতিমা বিসর্জন নিয়ে। বড় বাড়িকে টেক্কা দিতে গিয়ে ছোট বাড়ি আর পেরে ওঠে না। বন্ধুরা একজোট হয়ে ছোট তরফের দুর্গাগতিবাবুকে বললেন— 'তোমার টাকাগুলো শুধু উকিলে লুটছে, দুর্গাপুজোর ধুমধাম থাক। কথা শোনো— একটা মেয়েদের ইস্কুল খুলে দাও। বিদ্যেসাগর মশাইকে খবর দাও শুধু।' সত্যি তাই হল, বিস্তর কাজ ফেলে বিদ্যাসাগর মশাই ছুটে এলেন। দুর্গাগতি মজুমদারের স্ত্রীর মুখে গল্প শুনেছি—গ্রামসুদ্ধ লোক জড়ো হয়েছিলেন।

এই বিদ্যাসাগরের সঙ্গ দিনময়ী দেবীর কপালে বিশেষ জোটেনি। বনফুলের *বিদ্যাসাগর* নাটকে দিনময়ী দেবীর নিঃসঙ্গতা ফুটে উঠেছে। দিনময়ী দেবী লেখাপড়া

শেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্রই তৎক্ষণাৎ বিদ্যাসাগর সম্মত হন আর পরদিনই শোবার ঘরে বইখাতা জড়ো করেন। দিনের বেলায় অতি অল্প সময় বিদ্যাসাগর মশাই বাড়ি থাকতেন তাই শোবার ঘরে সকাল সকাল বৌ-ছেলেকে একসঙ্গে দেখামাত্রই ভগবতী দেবী বলে ওঠেন— 'সেই ভালো, ছেলে-বৌ শেলেট-খড়ি নিয়ে মেতে থাকুক আর আমি তাদের সংসার ঠেলি।' বিদ্যারম্ভের শুরুতেই বিঘ্ন, ব্যাপারটা আর এগোতে পারেনি।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বাল্যকালেই বিয়ে হয়। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করা দূরের কথা, কথা বলা পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল বহু বছর। ছেলেবেলায় তিনি একদিন একটি দালানে দাঁড়িয়ে থেকে দূরে অন্য এক ছাতে স্ত্রীকে দেখে কিছু বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের বাড়ির যে দাসী বাড়ির গৃহিণীর নির্দেশে তাঁদের ওপর নজর রাখত সে ব্যাপার দেখে চেঁচিয়ে ওঠে— 'ও মাঠাকরুণ দেখো এসে—তোমার রাম লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এ-ছাত থেকে ও-ছাতে ইশারায় বৌয়ের সঙ্গে কথা কইছে।' লজ্জা, ভয়ে রামেন্দ্র দ্রুত প্রস্থান করলেন। তাঁর স্ত্রীর কি শাস্তি হয়েছিল তার খোঁজ নেননি। লালগোলার কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণকে (সম্পর্কে নাতি) শেষ বয়েসে রামেন্দ্র বলেন প্রথম যৌবনে একদিনও স্ত্রীকে শয়নকক্ষে পাননি। '*মাসিক বসুমতী*-তে ছাপার সময় আরো দু'তিনটি শব্দ ছিল, সেই নিতান্ত মামুলি শব্দগুলি থাকলে ত্রিবেদীমশায়ের মর্যাদাহানি ঘটবে ভেবে বই ছাপানোর সময় তা বাদ দেওয়া হয়। (*ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর* দ্রষ্টব্য)।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা আর অতি প্রখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত ড. ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর মায়ের নির্দেশে সুদীর্ঘকাল তাঁর স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারেননি। ল্যান্সডাউন রোডে রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে ক্ষেত্রেশচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাই ড. মহাদেবপ্রসাদ সাহার সৌজন্যে। আমার প্রশ্নের উত্তরে তাঁর স্ত্রী স্বীকার করেন যে আমার শোনা ঘটনা সম্পূর্ণ নির্ভুল।

ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সৌন্দর্য-চেতনা আর স্বদেশপ্রীতির কবিতা বাঙলা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই আশ্চর্য মানুষটি চিরকালের মতো নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। কাব্য পড়লে মনে হয় তাঁর দিনগুলি ছিল নানা কলরবে, দেশ-বিদেশের বহু বিদ্যার চর্চায় উজ্জ্বল ও মুখর, আর রাত্রি ছিল নিত্য জ্যোৎস্নায় মণ্ডিত— কোথাও কৃষ্ণপক্ষের ছাপ নেই। *ভারতী* পত্রিকার মণিলাল গাঙ্গুলী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় আর চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বহুকাল আগে কোনো পত্রিকায় পড়েছিলুম চারুচন্দ্রের কাছে সত্যেন্দ্র কবুল করেছিলেন যে তিনি বিবাহিত হয়েও ব্রহ্মচারী। চারুবাবু স্তম্ভিত হয়ে আনুপূর্বিক সব শোনার পর বলেন— 'সত্যেন্দ্র, তুমি কি মানুষ! আমি তোমায় প্রণাম করব।' বিয়ের পরে মাতৃআজ্ঞায় ব্রহ্মচর্য পালন যে অনুচিত ও অশোভন তা চারুবাবু সংসারী এবং সাহিত্যিক হয়েও কেন বলেননি? এইটুকু শোনার পর থেকে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আত্মীয়া ইলা ঘোষ ব্যাপারটা নিয়ে সন্ধান করতে থাকেন। বাল্য বয়সে ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয় ছাত্রীনিবাসে কাটানোর পর থেকে ইলা ঘোষ সমাজের নানা জটিল চরিত্র নিয়ে একটি সংগ্রহপঞ্জী

বহু যত্নে তৈরি করেন, কে তাঁকে প্রেরণা দেন জানিনে। যক্ষ্মা রোগে ইলার অকালমৃত্যুর পর সমস্ত কাগজপত্র ফেলে দেওয়া হয়।

তখন সত্যেন্দ্রনাথ থাকতেন মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে। ঐ অঞ্চলে হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট থেকে হরি ঘোষ স্ট্রিট পর্যন্ত এলাকায় কলকাতার বহু পুরোনো বাসিন্দা পুরুষানুক্রমে বাস করতেন। তাঁদের মধ্যে গিয়ে বহু সময় ব্যয় করে বহু ধৈর্যে নানা বিচিত্র তথ্য তাঁর শ্বশুরবাড়ির চেনা পরিবার থেকে যা সংগ্রহ করেন সেসব টুকরো জোড়া-তাড়া দিলে এইরকম দাঁড়ায় :

সত্যেন্দ্রের স্ত্রী কনকলতা বিয়ের সময় খুব ছিপছিপে ও সুন্দরী ছিলেন। বিয়ের পর হাসিখুশিতে কটা দিন কাটিয়ে বাপের বাড়ি চলে যান আর কিছুকাল পরে বেশ সুস্থ ও মোটাসোটা হয়ে ফিরে আসেন। শাশুড়ি দেখেই বলে ওঠেন— 'ওমা, কি ধুমসি মেয়েগো, আমার ছেলেকে যে পিষে মেরে ফেলবে।' তাই তারপর মাতৃভক্ত সত্যেন্দ্র মায়ের খোকা হয়েই চিরকাল কাটিয়ে দিলেন। তাঁর কবিতায় কোথাও সেই চিরবিরহের খেদ এতটুকু নেই, অথচ মিলনের ছবিতে সব পরিপূর্ণ। যে-কোনো কবিতা পড়লেই দেখা যাবে খাপি জমিতে টানা-পোড়েনে একটি সুতোও ছিন্ন হয়নি—যেমন— 'এসো তুমি বাদলবায়ে ঝুলন ঝুলাবে, আজ আমাদের এই দোলাতেই দুজন কুলাবে।' এ যেন কাঙড়ার ছবি। কিংবা সেই চিত্তহারিণী জাপানি বালিকা—যে চন্দ্রমল্লী আর চেরী ফুলে সেজে মন্দিরে গিয়ে পতি-ভিক্ষা করছে— 'জনমের আগে সাথী ছিল যেগো মরণে যে পর নয় . . . দাও মোরে হেন পতি / চুম্বনে যার তরুণী ওহারু নারী হবে রাতারাতি।' কই কবি তো 'অন্যথা বৃত্তিচেতঃ' নন, তিনি সুখী, অত্যন্ত সুখী। রবীন্দ্রনাথ *পূরবী*তে এক জায়গায় বলেছেন :

তুই যদি যাস দূরে
তোরি সুরে
বেদনা-বিদ্যুৎ গানে গানে
ঝলিয়া উঠিবে নিত্য,
মোর চিত্ত
সচকিত আলোকে আলোকে। . . .

সত্যেন্দ্রনাথ একজনকে চির-নির্বাসনে পাঠিয়ে, অকম্পিত চিত্তে সেই বেদনা-বিদ্যুৎ নিয়েই ছন্দে সুরে, আজীবন ফুলঝুরি খেলে গেলেন। বোধহয় চল্লিশ বছর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটেছিল। রামানন্দবাবু *প্রবাসী*তে লেখেন— 'একপুত্রা মাতার শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমাদের নাই।' মা নাকি বলেছিলেন, 'একটা মাত্তর ছেলে— আমার বেখেয়ালিতে নাতিপুতি রইল না।' কনকলতা দেবী বিমর্ষভাবে থাকতে থাকতে ক্রমে নিঃশব্দ ও রুগ্ন হয়ে পড়েন। এক সময় *যুগান্তর* দৈনিক পত্রিকায় কবির সাহিত্য

ও জীবন নিয়ে সংক্ষেপে যে প্রবন্ধ লেখা হয় তাতে পাই কবির স্ত্রীকে লেখা চিঠির এই বয়ান— 'কল্যাণীয়াসু, তোমার কাসি ও গলার বেদনার কথা জানিলাম। গলায় পেন্ট লাগাইবে এবং নুন গরম জলে কুলকুচা করিবে। সুস্থ হইয়া পত্র দিবে। আশীর্বাদ জানিবে। ইতি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।' প্রবন্ধ লেখক বলেন—স্ত্রীকে লেখা কবির সব চিঠিরই ভাষা এইরকম। নিতান্ত *কাব্যসঞ্চয়ন* গ্রন্থের অনুমতি প্রকাশককে দেন তাই পাঠক জানতে পারে যে কবিপত্নীর নাম ছিল কনকলতা।

তীব্র আর তীক্ষ্ণ ভাষায় উজ্জ্বল গল্প লেখার জন্য বাঙলা সাহিত্যে যাঁর বিশিষ্ট স্থান সেই জ্যোতির্ময়ী দেবীর জীবনকথায় আর এক মাতৃভক্তের সন্ধান পাই। পশ্চিমের মরুভূমি থেকে সোজাসুজি হুগলি জেলায় দশ বছর বয়সে এক সদ্য পাস-করা উকিলের সঙ্গে তিনি বিবাহিত হলেন। জ্যোতির্ময়ী দেবী আমার চেয়ে ত্রিশ-বত্রিশ বছরের বয়সে বড় হলেও আমার সঙ্গে তাঁর অসম বয়সের অকপট বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর বিরাট চিঠির ভাণ্ডারও আমার জন্যে তিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন—খাওয়া-পরার কষ্ট দেওয়া, উঠতে-বসতে বাপের বাড়িকে বাপান্ত করার অধিকার তখন শাশুড়ি মাত্রেরই থাকত। জ্যোতির্ময়ীর বিবাহিত জীবনের কঠিনতম তিনটি অনুশাসন 'কালসর্পযোগে'র মতো তাঁকে জড়িয়েছিল। ছেলে বিহারে সামান্য উকিল। কোনোমতে মাঠকোটা ভাড়া করে আছেন। আর বৌ দেওয়ান বাড়ির মেয়ে, তাই সর্বদা শাশুড়ি হীনমন্যতায় ভুগতেন। বাপের বাড়ির কোনো উৎসবে—বিয়ে কি পৈতে বা অন্নপ্রাশনে কখনো তাঁকে যেতে দেননি। ছেলে কোনো প্রতিবাদ করেননি। প্রথম রোজগারের টাকা দিয়ে পুজোর সময় স্বামী একটি সুতির শাড়ি স্ত্রীকে কিনে এনে দেন। ছেলে সরে যেতেই শাশুড়ি সেটি অমুককে দেবেন বলে কেড়ে নিলেন। এবং ছেলেকে জানাতে বারণ করলেন—কঠিন দিব্যি দিয়ে। স্বামী যখন বলেন, 'সেই কাপড়খানা তো পরলে না?' তখন জ্যোতির্ময়ী নিরুত্তর। কারণ সেই কাপড়খানা তো তাঁর কাছে নেই। স্বামী ভাবলেন বড়লোকের মেয়ের কমদামী কাপড় পছন্দ হয়নি। অবশ্য জ্যোতির্ময়ী নিরুত্তর ছিলেন অশান্তি ও শপথভঙ্গের ভয়ে।

প্রথম সন্তান জন্মের পরই শাশুড়ি বৌকে ডেকে বললেন— 'রাত্রে মেয়েকে নিয়ে আমি শোব, তুমি ঘুমিয়ে পড়বে। মাঝরাতে গিয়ে বুঝে মেয়েকে দিয়ে আসব, ঘরের কপাট বন্ধ করো না।' ছেলে চুপ করে রইলেন, বৌ ভেবেছিলেন—হয়তো প্রথম সন্তানের বেলায় এই রীতি এদেশে। বাড়িতে তাঁর কোনো জা বা ননদ না থাকায় শাশুড়ি বেপরোয়াভাবে ঈর্ষ্যাতুর হয়ে 'ইতরের মতো' আচরণ করতে লাগলেন। ছেলে-বৌকে প্রথম রাত্রে শুতে দেখলেই তিনি এসে তাদের পায়ের দিকে শুয়ে শুয়ে বই পড়তেন, তাতে করে নাকি কেরোসিনের খরচ বাঁচানো হতো। বিকেলের দিকে কোনো ডুরে বা রঙিন শাড়ি পরতে দেখলে, জেদ করে খুলিয়ে নিতেন— 'এখানে গরীবের ঘরে ভালো কাপড় পরে কি করবে? বাপের বাড়িতে পরো।' শ্বশুর ভালোবাসতেন—সুযোগ পেলেই খোঁজ নিতেন, তাই শ্বশুরের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেবার চেষ্টা চলতে থাকে।

একদিন বাজার যাবার সময় শ্বশুর গলা খাঁকারি দিয়ে বলে ফেললেন— 'বৌমাকে জিগ্যেস করে দেখ না কি খাবেন ?' জ্যোতির্ময়ী বলেছিলেন—মাছের মুড়ো। পাটনায় তখন মাছ খুব সস্তা, বিহারী ভদ্রলোকেরা কেউ মাছ খেতেন না, বড় বড় মুড়ো দুই তিন বা চার পয়সা। যাই হোক, মাছ এল, কোটা ধোয়া রাঁধা সবই হল। খেতে বসে শুনতে হল— 'লুভিষ্টি, মায়ের সক্‌সকে নোলা ইনি পেয়েছেন তাই নেচে নেচে শ্বশুরের কাছে গিয়ে আবদার করে মাছ আদায় করলেন—এ তো সব বিদেশে রাজবাড়িতে চলে।' খেতে বসে চোখের জলে থালা ভেসে গেল। কাকে বা জানাবেন, তাই মুখ বুজে সহ্য করতে হল। তারপর শাশুড়ি নিয়ম জারী করলেন পরিবেশন বলতে বৌয়ের শুধু ভাত নেবার অধিকার রইল, মাছ-তরকারির নয়। মাছ-তরকারি সবাইকে দিয়ে শাশুড়ি এঁটো পাত থেকে যা দেবেন, তাই খেতে হবে।

স্বামীর কোনো মক্কেল বন্ধু বড় বড় মুড়ো পাঠিয়ে বলেছিলেন মুড়োই খাবেন পাঁচরকম করে। ইচ্ছে করেই সেদিন সেই বন্ধুর পাতে একটিও মুড়ো দেবার অধিকার দিলেন না জ্যোতির্ময়ীকে। বন্ধু কি মনে করলেন তিনিই জানেন। কি করে দুঃখ দেওয়া যায়—সেই ছল খুঁজে মরতে লাগলেন তিনি। মায়ের ছেলে পুরো নির্বাক।

স্বামী পরীক্ষা দিয়ে ভালো ফল করলেন, নামডাক হল, ওকালতিতে পশার বাড়ল কিন্তু তার অল্প কিছুদিন পরেই হঠাৎ তাঁর প্রচণ্ড জ্বর এল, বাড়ি ফিরেই প্রায় বেহুঁস হয়ে পড়লেন। জ্বর আরো বাড়তে, উঠে বসার ক্ষমতা ছিল না। বাইরের ঘরে এসেই জ্যোতির্ময়ী স্বামীর হাতটি ধরে বসে রইলেন। ভেতর থেকে নির্দেশ এল— 'হাতের চুড়িগুলো সব খুলে দিতে বল, ধার দেনা হচ্চে।' কি জানি হয়তো ভেবেছিলেন এর পরে খুলতে গেলে মোটামোটা চুড়ি হারিয়ে যেতে পারে। হঠাৎ পলকের জন্য স্বামী চোখ মেলেই বললেন— 'এখন থেকেই সব চুড়ি খুলে নিলেন !' সেই তাঁর শেষ কথা।

সুস্থ, শিক্ষিত ভদ্র মানুষেরাও এমন লোকাচারের দাস ছিলেন, তাই নির্বিচারে সহ্য করতে পেরেছিলেন সবরকম কুৎসিত আচরণ। সত্যি 'মা' শব্দটি থাকার দরুন ক্ষমা বড় পবিত্র আর মধুর !

বিভাব, নববর্ষ ১৪০২

অধিকার হরণ

ডঃরমেশচন্দ্র মজুমদার প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার জগতে নিঃসন্দেহে একজন দিক্‌পাল। ঢাকা থেকে *বৃহত্তর ভারতের* দু'খণ্ডে সুবর্ণদ্বীপ দিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু। *হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অফ্ দি ইন্ডিয়ান পিপ্‌ল* এগারো খণ্ডে সম্পাদনা বোধহয় তাঁর বৃহত্তম কাজ। পুত্র অশোককুমার পিতার গ্রন্থাদির সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। অশোককুমার গুর্জর-প্রতীহার যুগ নিয়ে গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা করে ভারতীয় বিদ্যাভবনের কানাইয়ালাল মুন্সীর স্নেহ ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। আমাদের বাড়িতে দাদা বিনয়কৃষ্ণের কাছে তাঁর যাতায়াত ও পত্র ব্যবহার দুই-ই নিয়মিত ছিল। রমেশচন্দ্রের সুদীর্ঘ জীবনে বিদ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং ধনাগম সবই বর্ধিত অঙ্কে শীর্ষে স্থান পায়। রমেশচন্দ্রের একাধিক কন্যা থাকলেও তাঁর পুত্র একটিই, তাতে জননী প্রিয়বালা দেবী হঠাৎ বংশরক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে সন্তানহীন পুত্রকে দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য অনুরোধ করলেন। পুত্র এই সামান্য কারণে বিবাহিতা পত্নী ত্যাগ করতে কোনোরূপে সম্মত হলেন না। তখন তাঁর জননী অর্থলোভ দেখালেন অর্থাৎ বিবাহ না করলে পিতার সম্পত্তির অধিকারচ্যুত হতে হবে, ত্যজ্যপুত্র করবেন এমন কথা পিতাকে দিয়েই বলালেন। অশোক তাতেও সংকল্পচ্যুত হলেন না, বিপিন পাল রোডের মস্তবড় বাড়ির মায়া ছেড়ে শান্তিনিকেতনে অতি ক্ষুদ্র বাড়িতে (কর্ণিকার) রইলেন দীর্ঘকাল। সেখানে তাঁর একাগ্র বিদ্যাচর্চা আর স্ত্রীর অনুক্ষণ সেবা নিজের চোখে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। রমেশ মজুমদারের মৃত্যুসংবাদ দৈনিক কাগজে এভাবে বেরোয় যে দেশমান্য পিতার শেষকৃত্য করতেও পুত্র আসেননি, তিনি নিভৃত অবসর জীবনযাপন করছেন। অশোক পিতার মৃত্যুর পরে বিনয়দাকে বলেন— 'বাবা তাঁর বাড়ি বা মা তাঁর অলঙ্কার মেয়েদের দেবেন এ তো জানাই ছিল, কিন্তু বাবা বইগুলো আমাকেই দিয়ে যেতে পারতেন—তাও দিলেন না।' একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং দেশমান্য ঐতিহাসিক স্ত্রীর বশ হয়ে নিজের জেদ এবং অকারণে ছেলের অধিকার হরণের যে দৃষ্টান্ত রাখলেন তাতে রাজা দশরথের বৃত্তান্ত আবার মনে পড়ে।

আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর জীবিতকালেই দেশের সর্বত্র শ্রদ্ধাভক্তি অর্জন করেন। তাঁর *আত্মচরিতের* মতো সুখপাঠ্য বই সে যুগে অল্পই ছিল। বালক বয়েসেই তাঁর বিবাহ হয়, স্ত্রীর নাম প্রসন্নময়ী। শিবনাথের পিতা হরানন্দ বিদ্যাসাগর প্রসন্নময়ীর পিতৃকুলের দোষ আবিষ্কার করে পুত্রের আবার বিবাহ দেন, এই স্ত্রীর নাম বিরাজমোহিনী। দুই

স্ত্রীকে নিয়ে একগৃহে বাস করার সঙ্কটের কথা *আত্মচরিতে* স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে। নিজে সংসারী হবার পর শিবনাথ প্রসন্নময়ীকেই স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রসন্নময়ীর সমাজসেবা, ঔদার্য, সন্তানবাৎসল্য, সত্যনিষ্ঠা ইত্যাদি নানা গুণের কথা *আত্মচরিতে* অনেকগুলি পৃষ্ঠা জুড়ে আছে। শিবনাথ বিরাজমোহিনীর পুনরায় বিবাহ দেবার প্রস্তাব করলে, বিরাজমোহিনী দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন কিন্তু তাঁর পিতৃগৃহের আশ্রয় দৃঢ় ছিল না, অগত্যা শিবনাথের গৃহে প্রসন্নময়ীর সঙ্গিনী হয়েই তাঁকে থাকতে হয়। যদিচ বিরাজমোহিনীর নিজের বিবাহে কোনো দায়িত্ব বা অধিকার ছিল না, তবু তাঁর একাকিত্ব নিয়ে শিবনাথ কোনোদিন চিন্তিত ছিলেন না। প্রসন্নময়ীর মৃত্যুর পরে শিবনাথ যখন তাঁকে পুরোপুরি পত্নীভাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হন, তখন তা প্রত্যাখ্যান করে তিনি যথেষ্ট শক্তি ও মনোবলের পরিচয় দেন। (শিবনাথের *অপ্রকাশিত পত্রাবলী* দ্রষ্টব্য)।

এখন যে উপেক্ষিতা-মহিলার কথা বলতে যাচ্ছি তাঁর জন্ম উত্তরপ্রদেশে। ত্রিপিটকাচার্য-সমাজবাদী দার্শনিক রাহুল সাংকৃত্যায়নের তিনি প্রথম পত্নী। এগারো বৎসর বয়েসে আজমগড় জেলার পন্দ্‌হাগ্রামে রীতিমতো মিছিল করে রাহুল বিয়ে করতে যান। এই বিয়েকে রাহুল সারাজীবন উচ্চকণ্ঠে অস্বীকার করে নিজের বিবেককে সুস্থ এবং পরিচ্ছন্ন রাখতে চেয়েছেন, কিন্তু কার সঙ্গে লড়াই ? রামমোহন বিদ্যাসাগর এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনের কারণে কলকাতা এবং বঙ্গভূমির শহর অঞ্চলে শিক্ষিত হিন্দু পরিবারে দশ-এগারো বছরে ছেলেদের বিয়ের কথা তেমন শোনা যেত না কিন্তু সরযূনদী পেরিয়ে আজমগড অঞ্চলে বাল্যবিবাহ খুব স্বাভাবিক ঘটনা। বিশেষত, ঐসব ক্ষেত্রে মেয়েদের অধিকাব বা দায়িত্ব বলতে বিন্দুবিসর্গ কখনই ছিল না। এই অবস্থায় বিয়ের ৩০ বছর পরে কৃতী ও সুপণ্ডিত হয়ে নিজের গ্রামে ফেরার পরে একটি আপাদমস্তক কাপড়ে মোড়া স্ত্রীমূর্তি যখন তাঁর পায়ের ওপর পড়ে, তখন রাহুল তাকে বিশ্বসংসারের অচ্ছুৎ জ্ঞান করলেন কেন ? কোন অধিকারে ? নিরুপায় মেয়েটিকে সর্বসমক্ষে তিনি স্ত্রী বলে স্বীকার না করে বললেন—এই ছেলেখেলার বিয়ের কোনো দায়িত্ব তিনি নেবেন না। দায়িত্ব কি তবে ঐ মেয়েটিরই ছিল ? মেয়েটি কিছু টাকা চায়— তীর্থযাত্রার কড়ি। রাহুল তাও দিলেন না। মাসোহারা দেওয়া দূরের কথা, একবার মাত্র থোক টাকা দিলে তাঁর মহাভারত অশুদ্ধ হতো কি ? রাহুল রাশিয়ায় গিয়ে লোলাকে আর প্রায় শেষ জীবনে প্রাইভেট সেক্রেটারি—নেপালী মেয়েকে (কমলা দোরজি) বিয়ে করেছিলেন সেসব কথা সকলেরই জানা। সরল গ্রাম্য পিতৃকুল শ্বশুরকুলে আশ্রয়হীনা নামগোত্রহীনা এই মেয়েটিকে দয়া করতে তাঁর ভাঁড়ার শুকিয়ে গেল ! এই কি এঁদের সাম্যবাদ আর সমাজবাদ ! সংসারে শত শত অনাদৃতা বা উপেক্ষিতা মহিলা ছিলেন, আছেন বা থাকবেন। সাধুসন্তরা যখনই গৃহত্যাগ করেন তখনই তাঁদের পত্নীরা সঙ্গীহীন অনাদৃত জীবনযাপনে বাধ্য হন। তবে আধুনিককালে চিন্তাশীল বিবেকী মানুষদের দায়িত্বহীন হতে দেখলে মানুষ দুঃখ পায়। স্বামী-পরিত্যক্তা বা বিধবা একই কথা, পিতৃগৃহে মর্যাদাহীন হয়ে বিনা-মাইনের সেবিকা ছিলেন তাঁরা।

শ্রদ্ধেয়া জ্যোতির্ময়ী দেবীর মুখের কথা একটু বলি। একবার তাঁর কোনো ভগ্নীপতির ক্ষয়রোগ হয়। ছোঁয়াচের ভয়ে কচি ছেলে নিয়ে তাঁর স্ত্রী সরে এলেন। তখন দূর পাহাড়ে বাঙালী মেয়েরা সেবা করতে যেতে চাইতেন না। লেখিকার মা ব্যবস্থা দিলেন—'জ্যোতু যাক, ওর যদি কিছু হয় ওর ছেলেমেয়েদের তখন আমরাই দেখব।'

আমাদের নিজেদের ঘরেও তাই দেখেছি—স্বামীর ঘর ছেড়ে এসে আমাদের ঘরে মুরলা এলেন কিন্তু তাঁর ডাইনে বাঁয়ে দুই বিত্তবতী এবং সন্তানবতী ভগ্নী। তাদের অসুখে বিসুখে সেবা পরিচর্যায় আর সন্তানপালনে মুরলার জীবনের বারো আনাই ক্ষয়ে যায়। দুঃখী মেয়ে তো দুঃখ পাবেই! ভগবান যার কপালে যা লিখেছেন। মায়ের ওপর কর্তব্য থাকে ছেলেদের, যে মাসী মানুষ করে, খাওয়া দাওয়া ভুলে রাতের পর রাত জাগে সে তখন তখন ধাইমার মতো অপরিহার্য। তারপর? সেকালে কিছু টাকা হাতে ধরিয়ে কাশী পাঠিয়ে দেওয়া হয়ত এর চেয়ে ভালো ছিল। কোনো প্রত্যাশা ছিল না মাসকাবারের। ঘুরে-ফিরে, পরের বাড়ি রেঁধে-বেড়ে বেশ পাকাপোক্ত হয়ে যেতেন সেই মহিলারা।

এ-যুগে অধিকার কতটুকু আর কি পর্যন্ত, তার বিচারের মাপকাঠি হয়ত আলাদা।

বিভাব, শারদীয় ১৪০২

বিড়ম্বিতা

কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরের উল্টোদিকে বিদ্যাসাগর বাণীভবন বিধবা মহিলাদের সবরকম শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, লেডি অবলা বসু তার সভানেত্রী ছিলেন। সুকুমার রায়ের স্ত্রী সুপ্রভা দেবী ছিলেন প্রধানা শিক্ষিকা। বিবাহিতা মহিলাদের জন্য সেখানেই ছিল নারী-শিক্ষা-সমিতি, তার প্রধান শিক্ষিকা শ্রীযুক্তা অমিয়া দেব ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের কন্যা। এই দুই প্রতিষ্ঠানেই মেয়েরা সবরকম সেলাই, বোনা, ছাঁটকাট, তাঁত-বোনা, ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া, চামড়ার নক্‌শা তোলা, বাটিকের কাজ, ছবি ও বই বাঁধাই শিখত অর্থাৎ রাঁধাবাড়া ছাড়া দরকারি অদরকারি সবরকম ছোটখাট শিল্পের চর্চা এখানে হতো।

এখানকার ছাত্রী ছিলেন মুরলা, অনেকদিন শেখার পর একে একে লেডীব্রাবোর্ন ডিপ্লোমাগুলি পাস করে বোমাপড়ার সময়ে শিক্ষা-সমিতি যখন কৃষ্ণনগর শহরে চলে যায় তখন তিনি তার শিক্ষিকাও হয়েছিলেন। এখানে কয়েকঘন্টা সময় মুরলার বড় আনন্দে কাটত। জীবনে প্রথম তিনি তাঁর স্বভাবের ও কাজের প্রশংসা শুনে নিশ্চয় আনন্দ পেয়েছিলেন। প্রথম থেকে ভয়ঙ্কর গোঁড়া পরিবেশে জর্জরিত হয়েও তিনি আশ্চর্যরকম সংস্কারমুক্ত ছিলেন, তাছাড়া পিসিমা শিবমোহিনীর (নববিধান সমাজের প্রচারকের স্ত্রী) প্রভাবে তিনি নিজেই নিজেকে গড়ে নিয়েছিলেন। তাঁর বাবা প্রেসিডেন্সি কলেজের সে-যুগের একজন ইংরেজিনবিশ হয়েও পুরোপুরি সংসারজ্ঞান-বিবর্জিত ছিলেন। *স্টেটস্‌ম্যান* কাগজে মেডিকেল কলেজ থেকে কোনো ছাত্র তিনটি বিষয়ে রেকর্ড নম্বর পেয়ে এম.বি. হয়েছে খবর দেখেই মনে মনে তার সঙ্গে মুরলার বিয়ে স্থির করেন তাঁর এক বন্ধু, উভয়পক্ষে যিনি পরিচিত, তিনিই সব ব্যবস্থা করে দিলেন।

পাত্রের বাড়ি যশোর জেলার জঙ্গলবাধালে, তাঁর বাবা-মা, নিজস্ব ঘরবাড়ি কিছুই ছিল না। মামাদের কিছু জমিদারি ছিল, পাত্রপক্ষ সেটি জানিয়ে বাকি সব কথাই গোপন করে যান। পাত্র নিজের জন্য হীরের আংটি, ভারী সোনার বোতাম ও চেনঘড়ি এবং নগদ আড়াই হাজার টাকা দাবি করেন, কিন্তু তা নেবার পরেও আরো পাঁচশো টাকার দাবি করে মুরলার জীবন অতিষ্ঠ করেন, অর্থাৎ, ক্রমাগত দাবি করতেই থাকেন। ছাত্রজীবনে ভদ্রলোক দু'বার অপ্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন—একথাও কন্যাপক্ষ জানতে পারেননি। বিয়ের অল্পদিন পরেই মুরলা সন্দিগ্ধ চরিত্র ভদ্রলোকের একটু একটু পরিচয়

পান। মুরলা ছিলেন আমুদে ও হাসিখুশি স্বভাবের, তাঁর সংসার জীবনের জটিলতার জ্ঞান বিন্দুমাত্র ছিল না। তিনি তাঁর দাদাদের বন্ধুদের এবং পাড়ার বান্ধবীদের স্বামীদের সঙ্গে অবলীলায় কথা বলেন জেনে, তাঁর স্বামী তাঁকে নানারকমভাবে জেরা করতে থাকেন। যেমন—ছেলে না মেয়ে কাদের সঙ্গে কথা বলতে ভালোবাসেন এ-প্রশ্নের উত্তরে মুরলা অকপটে বলেন যে ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতেই তিনি ভালোবাসেন, কারণ তাঁরা নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেন ও তর্ক করেন, আর মেয়েদের সেই পরচর্চা আর সংসারের কথা, এসব তাঁর ভালো লাগে না। তখন তাঁর স্বামী এসব কথা গুছিয়ে লিখে দিতে বললে মুরলা সহজভাবে সব লিখে দেন আর ভদ্রলোক কাগজটি ভাঁজ করে পকেটে রেখে বলেন—পরে সেটা খুব কাজে লাগবে।

ভদ্রলোকের দিদি আর ভগ্নীপতি শ্যামবাজারে ছোট দু'খানি ঘর নিয়ে থাকতেন। সেখান থেকে মুরলাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর স্বামী মধ্যে-মধ্যে রাস্তায় ঘুরতে বেরোতেন। সে-যুগে ভদ্রঘরের মেয়েদের পায়ে হেঁটে রাস্তায় বেরুনো কল্পনার বাইরে ছিল। যাই হোক, একদিন পুলিশ তাড়া করে বলে, 'জরু লেকর কাঁহা ভাগ্‌তা তোম্‌', মুরলাই এগিয়ে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলেন। ভদ্রলোক চুপ করে থাকেন ও পরে বলেন, 'হিন্দীতে কথা বলতে কি করে শিখলে ?' আরো বলেন, 'চরিত্রহীন মেয়েরাই এভাবে রাস্তায় ঘোরে এবং পুলিশের সঙ্গে সোজাসুজি কথা তারাই বলতে পারে।' মুরলা ছাপরায় দিদির কাছে থেকে চলতি হিন্দী ভালোই বলতে পারতেন। বাড়ি ফিরে ঐ কৈফিয়তে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি মুরলাকে কম্বল চাপা দিয়ে পেতলের মোটা ঘটি দিয়ে দারুণ প্রহার করেন, আরও বলেন এর নাম 'কম্বল প্যারেড'। এসব প্রহারের ফলে ভোরে কাজের জন্য ওঠার কোনো ক্ষমতা মুরলার থাকত না—পাড়ার লোক জড়ো হলেও না। তাঁর আঁচলে কি বাঁধা ছিল তা খুলে দেখা গেল, সেটি বাপের বাড়ি থেকে আনা আমসত্ত্বের টুকরো। বৌ চুরি করে খায় তাও প্রমাণ হয়ে গেল। শ্বশুরবাড়িতে আমসত্ত্ব ছিল না সেকথা তিনি ভয়ে উচ্চারণ করতেও পারেননি। নিজের ছাত্রজীবনের দারিদ্র্যের কথা বলে তিনি মুরলার করুণা উদ্রেকের কৌশল ভালোই জানতেন। ক্রমাগত স্ত্রীকে সন্দেহ করে নানা কুৎসিত কথা বলে একদিন সেই ভদ্রলোক পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

নানা অত্যাচারের মাত্রা বেশী হতে মুরলা মামাশ্বশুরের বাড়ি আশ্রয় নেন, তাঁরাই বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে মুরলাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেন। বাপের বাড়িতে এসেও শান্তি ছিল না। ইংরেজি শেখবার একান্ত ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মামা ও মেসো বললেন, 'মেয়ে আবার মানুষ হবে, কেতাব পড়বে, বক্তিমে করবে, এ যে দেখচি তেঁতুলপাতার বগ্‌লী (বটুয়া) হবে।' বাপের বাড়িতে গুরুজনদের তিরস্কার ছাড়া ভাগ্যে কিছু জোটেনি। এমন-কী গহনা বিক্রি করতে গিয়ে তাঁদের দ্বারাই একাধিকবার প্রতারিত হন। শেষকালে নিজে-নিজেই পাড়ার মানুষের মধ্যে সেবার কাজ বেছে নেন। কে বাতে পঙ্গু, কার টাইফয়েডের পর জ্বর ছাড়ে না ইত্যাদি রোগীর একের পর এক সেবা করতে থাকেন।

জ্যেঠতুতো দাদা বলতেন, 'নার্স-ডি-বেলেঘাটা'। নার্সিং ক্লাসে যোগ দেওয়ার একান্ত ইচ্ছে পূর্ণ হল না। নার্স হতে গেলেই নাকি চরিত্র খোয়াতে হয়। যাই হোক, বোনেদের দশ-বারোটি ছেলেমেয়ে মানুষ করেছিলেন। তাতে করে সন্তান-ক্ষুধা হয়ত মিটেছিল। কিন্তু পর তো আপন হয় না! মেয়েলি ছড়ায় আছে : 'মাকে দোব পাটের শাড়ি/ বাবাকে দোব ঘোড়া/ মাসীমা গো, কোরো না গোঁসা/ তোমাকে দোব পুঁটিমাছের রসা।' তা এই পুঁটিমাছের রসাটুকুও তিনি কারও কাছে পাননি।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের *অবলাবান্ধব* পড়ে, শ্রীমতী অমিয়া দেবের স্নেহে ও পরামর্শে নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমতো দুঃখী মেয়েদের জন্য সাহায্য-সমিতি করেছিলেন। গরীব বিধবার মেয়েদের বিয়ে দেবার জন্যে চাঁদা তোলা তাঁর নিত্যকর্ম ছিল। সুন্দর হাতের কাজের জন্য নারী-শিক্ষা-সমিতি থেকে একাধিকবার সার্টিফিকেট ও মেডেল পেয়েছেন। বিমল বসু পরিচালিত *মহিলা-মহলে* তাঁর লেখা ছাপা হয়েছিল। হাতে লেখা পত্রিকা *নব-নির্মাল্যে*-র ছ'সাত বছর সম্পাদনা করেছিলেন। ছড়া সংগ্রহ, জীবনী সংগ্রহ, চিঠি লিখে লিখে সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, ফোটো তোলা, *ভারতবর্ষ* পত্রিকা থেকে খ্যাতনামাদের রঙিন ছবি কেটে অ্যালবাম তৈরি করা, কী যে না করেছেন! ভালো উল বুনতেন, একখানি বড় সেলাইয়ের বইয়ের পাণ্ডুলিপি আর আগাম তিনশো টাকা কোনো পরিচিত প্রকাশক নিয়ে ছাপিয়েও দিলেন না, টাকাও ফেরত দিলেন না। সবরকম বঞ্চনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথই মুরলার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন ছিলেন।

কৃষ্ণনগরে যাবার পর অতিরিক্ত পরিশ্রমে সামান্য পঁচিশ টাকা মাইনেতে খাওয়া-দাওয়া-খয়রাতি সব চালিয়ে মুরলার শরীর ভেঙে পড়ে। তারপর ভয়ঙ্কর রকমের প্লুরিসি হয়। যমে-মানুষে টানাটানি চলে দীর্ঘকাল। একরকম প্রায় অকর্মণ্য হয়ে যান। তাঁর সংগৃহীত মালমশলা থেকে দুটি ভাগ্য-বিড়ম্বিতা মহিলার কথা এখানে উল্লেখ করছি।

মনোরমা নামে একটি মেয়ে নারী-শিক্ষায় হাতের কাজ শিখতেন। দেখা গেল তিনি কিছুই শিখতে পারছেন না। আজ যা শিখছেন পরদিন তা ভুলে যাচ্ছেন। মুরলা তাঁকে বহু চেষ্টায় শেখাতে না পেরে একদিন রাগ করে বললেন, 'আর ক'মাস ধরে একই প্যাটার্ন শেখাব!' এ-কথা বলতেই মনোরমা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। এতদিন সকলে জানতেন তাঁর স্বামী শ্যামাসংগীত গেয়ে প্রচুর উপার্জন করে থাকেন। ইদানিং রক্তবস্ত্র ও জবার মালা পরে আসনে বসে বোতলে চুমুক দিয়ে বলতেন, 'এটা কারণ-বারি, এতে সাধনার শক্তি বাড়ে।' কিছুদিন পরে আবার বললেন, 'একটি ভৈরবী চাই।' ছোট ঘর— সিন্দুক, তক্তপোষ ও হারমোনিয়ম ছাড়া পা মেলবার জায়গা বিশেষ ছিল না। ভৈরবী এসে বললেন, 'বাইরের রোয়াকে তোমার বউয়ের শোবার জায়গা করে দাও।' সেই খোলা রোয়াকে কোনো মেয়ের পক্ষেই শোওয়া সম্ভব ছিল না। হারমোনিয়ম, তবলার পাশে গুটিসুটি মেরে মনোরমা শুয়ে থাকলেও ভৈরবী তাঁকে লাথি মারতেন। কিন্তু তাতেও তাঁর আক্রোশ না মেটায় মৃণালকান্তিকে বলে নিজেদের খাটের নীচেই

মনোরমার শোয়ার ব্যবস্থা হল। দিনের পর দিন নানা কুৎসিত আচরণ ও কদর্য দৃশ্য দেখে মনোরমা ক্রমশ জড়বুদ্ধি হয়ে গেলেন।

এইসব বৃত্তান্ত শুনে মুরলা তাঁকে বলেন, তিনিই বা খাটের নীচে শোন কেন? 'আপনার কি আর কোনো চুলোয় জায়গা নেই?' এই 'চুলো' কথাটা মনোরমাকে বড় আঘাত দিয়েছিল। আস্তে আস্তে কেঁদে বলেন, 'বাবা তো পণের টাকা ধার করে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন, বাপের বাড়ি যে যাব তারও উপায় নেই, সেখানেও সৎ-মা। অন্য মেয়ে হলে জলে ডুবে মরত। মরতে আমার বড় ভয় দিদি, বড় ভয়!' মনোরমা ক্রমে-ক্রমে বোধহয় পাগল হয়ে যান।

গড়পার না বেনেটোলা কোথায় যেন নীলিমার বাড়ি ছিল। সেকালের ভাষায় সাকারা সুন্দরী বলতে যা বোঝায় নীলিমা তাই ছিলেন। মাথাভর্তি ঢেউখেলানো কালো চুল, যেমন মুখশ্রী তেমনি গায়ের রঙ—দোহারা গড়ন আর সর্বাঙ্গে ঝল্‌মল্‌ করত আল্‌গা চটক। তাঁর বাবা ছিলেন অতি দরিদ্র, তাই টাকার অভাবে তিনি ঐ সুন্দরী মেয়েকে এক বৃদ্ধের হাতে দেন। নীলিমার বৃদ্ধ স্বামীর রোজগার ভালো ছিল না। বৌ পালিয়ে যাবে মনে করে রোজ ঘরে তালা দিয়ে বেরোতেন। একদিন শাশুড়ি-ননদ বাড়ি না থাকায় নীলিমা লোক জড়ো করে পাড়ার বামুন-গিন্নিকে সর্বাঙ্গে মারের দাগ দেখিয়ে আশ্রয় চান। তিনি কিভাবে যেন তাঁকে পুলিশের সাহায্যে উদ্ধার করেন এবং ২/৪ দিন বিধবা-আশ্রমে রাখেন। কিন্তু বিধবা না হওয়ার জন্য কোনো আশ্রম রাখতে চাইত না। তিনি ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী, তাই গৃহস্থঘরে থাকাও নিরাপদ ছিল না। নারী-শিক্ষা-সমিতির অমিয়া দেব এবং তাঁর স্বামী সাংবাদিক সুরেশচন্দ্র দেব দু'জনে মিলে কোনো ব্রাহ্মবাড়িতে মাথা গোঁজার আশ্রয় খুঁজে দেন। অমিয়াদি মনে হয় সেখানে নীলিমার খাওয়ার খরচ দিতেন।

নারী-শিক্ষা-সমিতিতে এসে নীলিমার যেন নব-জন্ম হল—বোনা, সেলাই তো বটেই, আসন বা তাঁত বুনে সেগুলো অমিয়াদি সমিতির মারফৎ বিক্রি করে দিতেন। মাটির মূর্তি গড়ার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর ছিল। মাস্টার মশাই নিতাইচন্দ্র পাল নীলিমাকে খুব স্নেহ করতেন, বলেছিলেন— 'তুমি মেয়ে না হলে আমার সঙ্গে পুজোর মূর্তি গড়ার কাজে তোমাকে নিতুম। তুমি কিছু টাকাও পেতে।' বেশ কয়েকবছর কাটবার পরে মুখে-মুখে শোনা গেল সেই স্বামী-রূপী বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। সকলেই তাঁর বিয়ের প্রস্তাব করতে লাগলেন। নীলিমা নিজে থেকে একদিন পালমশাইকে বললেন— 'মাস্টার মশাই, সকলেই বিয়ের কথা বলচেন। ছেলেমেয়েও নেই, কিন্তু আমি পাত্র কোথায় পাব—আপনারা দেখে দিন।' মাস্টার মশাই শিউরে বললেন— 'ছি! ছি! বিধবার বিয়ে! আমি কেমন করে দেখে দেব? তুমি কাজকর্ম শিখেছ, এই ইস্কুলেই তোমার দিন কেটে যাবে।'

নারী-শিক্ষা-সমিতি যখন কৃষ্ণনগরে যায় তখন আমি নীলিমাদিকে দেখি। মুরলার

পরামর্শে তিনি থানধুতি না পরে সরু পাড়ের দিশী শাড়ি পরতেন। হাসি-হাসি মুখে বলেছিলেন, 'ভাই, মুরলাদি জেদ করে ধুতি ছাড়িয়ে পেড়ে-শাড়ি পরিয়েছে, আমি ধুতিই পরতুম।' লোকভয়ে মাছ খাননি মুরলার চেষ্টা সত্ত্বেও। শ্রীযুক্তা অমিয়া দেব নীলিমার তখনকার মতো কর্মসংস্থান করে দেন। তারপর তিনি কেমন ছিলেন আর খোঁজ নিতে পারিনি।

১৯৯৫

সেকালের ভেতরবাড়ি

আমার কোনো বন্ধুর ছেলে এক সময় তার মাকে বলেছিল— 'বলো কি ! সব-সময় তোমাদের বাড়িতে বিশ-তিরিশজন লোক থাকতই ? আবার কখনও চল্লিশ-পঞ্চাশজন হতো ? বাব্বা, ক্লাব না হোস্টেল ! অথচ তোমার দাদু তো ছিলেন অধ্যাপক !' খুব সত্যি কথা। কিন্তু পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে এইরকম মানুষ বেশ কিছু ছিলেন বই-কি ! মধ্যবিত্ত ঘরে যা নিজের চোখে দেখেছি আর কানে শুনেছি সেইরকম দু'চারটে ঘরোয়া কথা বলার চেষ্টা করি— যা ওলোটপালোট হয়েও কিছু ছাপ রেখে গেছে স্মৃতির ভাঁড়ারে।

বঙ্কিমী যুগ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সাহিত্যে অনেকেই যা লিখেছেন তার এক বড় অংশে একান্নবর্তী পরিবার তার ফুল ও কাঁটা দুই নিয়েই বিরাজ করছে। গল্প ছাড়াও সেখানে সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি, স্বদেশীয়ানা, প্রেম, ধর্ম সবই আছে। আমি তাই সেদিনের এক ধরনের অলস জীবনের অস্পষ্ট কিছু ছবি ফিরে ফিরে দেখার চেষ্টা করছি।

কলকাতার যৌথ পরিবার অনেক সময় একটি বাড়িতে আবদ্ধ থাকত না, প্রায় গোটা পাড়া জুড়ে শেকড় গেড়ে বসত। সবাই সবাইকার হাঁড়ির খবর রাখত, সুখে দুঃখে ছুটে আসত, নিন্দেমন্দ, ঝগড়াঝাঁটি, কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি সবেরই ভাগাভাগি ছিল। সুগন্ধ বা সৌখিনতা ছিল না, তবে একটা অকপট, অমার্জিত রূপ ছিল। অধিকাংশ পরিবারের কর্তারা মাস গেলে কিছু টাকা গিন্নির হাতে ধরে দিয়ে বাকী সময় সাংখ্যদর্শনের পুরুষের মতো আড়ালেই থাকতেন। গিন্নিরা কি শীত, কি গ্রীষ্ম রাত চারটেয় উঠে চৌবাচ্চার বাসি জলে স্নান করে, চুলে ঝুঁটি বেঁধে, তুলসীগাছে জল দিয়ে ঠাকুরঘরে একটা প্রণাম সেরে রান্নাঘরে আসতেন। তখন ভোর পাঁচটা বাজত, বেরোতেন আন্দাজ দুটো। তারপর ঠাকুরঘরের পালা সাঙ্গ করে বেলা আড়াইটে-তিনটের আগে তাঁদের ভাত খাওয়া ঘটত না। আমাদের পাড়ার কোনো এক বাড়ির নাইবার ঘরে সত্যি সত্যি পাত্‌কো (পাতকুয়ো) দেখেছি— মুখে তার মস্ত পাথরচাপা। শুনতুম বেহ্মদত্তিরা সেই পাথরটা মধ্যে মধ্যে তোলার নাকি চেষ্টা করত ! ওদিকে উঠোনে ভোর থেকে ছর্-ছর্ করে জল পড়ত কল থেকে, পাশেই মস্ত চৌবাচ্চা— তার পাড়ে সারি সারি কলাইয়ের বাটিতে কর্তাদের নিম বা পেয়ারা দাঁতন কিংবা অষ্টবজ্র মাজন। পরে এলো 'কলিনোস' টুথপেস্ট। মেয়েরা

ব্যবহার করতেন তামাকের গুল বা ঘুঁটের ছাই। ছোটদের দল বাঁ-হাতে তেল-নুন কিংবা খড়ি-ফিট্‌কিরি নিয়ে হেলেদুলে বহুক্ষণ ধরে দাঁত মাজতো। তারপরে খাবার ঘরে কাঁঠাল কাঠের পিঁড়েয় বসে দু'খানি লুচির সঙ্গে আলু-পটল-কুমড়োর ছেঁচ্‌কি, একটু সুজির মোহনভোগ কিংবা দুটি নারকোল নাড়ু খেত। বয়স্ক ছেলেরা বিছানায় শুয়ে ছটা নাগাদ চা খেতেন। তারপরে ধীরেসুস্থে মুখটুখ ধুয়ে খান দু'চার অতি ছোট ফুল্‌কো লুচি ও ভাজাভুজি দিয়ে প্রাতরাশ সারতেন। জামাই এলে কিংবা ছুটিছাটার দিনে কচুরি সিঙ্গারা ইত্যাদি হরেকরকম নোন্‌তার বাহার খুলত। মেয়েরা বাড়িতে মা-দিদিমার কাছেই রান্না শিখতেন, তবু কোনো কোনো বাড়িতে উপলক্ষ্য বিশেষের জন্যে রান্নার বইও ছিল। তার মধ্যে বিপ্রদাস মুখুজ্যের *পাক-প্রণালী* আর *মিষ্টান্নপাক*-ই ছিল সেরা। বারোমাস মাছভাত সবার জুটত। জামাই, কুটুম এলে তবেই মাংস কাঁকড়া আসত। ডিম খাওয়ার চল কম ছিল, আর তখন ডিম বলতে ছিল শুধু হাঁসের ডিম। মুরগীর ডিম, মাংস চলত না। মাছ নিয়ে রান্নার ঘটাই শুধু নয়—মাছের তত্ত্ব, মাছবরণ এসবও ছিল। বিশেষ বিশেষ শুভকর্ম মাছ ছাড়া চলত না। বেলা আটটা না বাজতে বাজতে আপিসের বাবুদের ভাতের তাড়া শুরু হতো। যেসব বাড়িতে রাঁধুনীবামুন থাকত সেখানেও বউ-মেয়েরা তটস্থ থাকতেন সেই সময়টা। বাবুরা ('সকড়ি' তখুনি পেড়ে না নিলে এঁটো-চণ্ডী আপিসে গিয়ে কাজ ভণ্ডুল করে দিতেন) খেয়ে উঠবেন, কেউ হাতে জল দেবে, গামছা এগিয়ে দেবে। পান মশলা, রুমাল এসব হাতে হাতে যোগান দেওয়া, পালিশ করা জুতো এগিয়ে দেওয়া ছিল নিত্য নৈমিত্তিক কাজ। কোনো কোনো বাড়ির বউদের আবার আরশিও এগিয়ে দিতে হতো—টেরি ঠিক করে নিয়ে পানের ডিবে হাতে দুর্গানাম করতে করতে বাবুরা বাড়ির বাইরে পা দিতেন। তারপরে আসত ইস্কুল কলেজে পড়ুয়াদের খেতে বসার পালা। কুচোকাচাদের, রুগীদের, বুড়োদের মর্জিমাফিক খাইয়ে বাড়ির মেয়ে-বউদের পালা শুরু হতো। তারপরে ঝি-চাকরদের ভাত বেড়ে দিয়ে বাড়ির গিন্নিরা বেলা আড়াইটে আন্দাজ যখন খেতে বসতেন তখন প্রায়ই মাছ তরকারি কম পড়ে যেত। পড়ে থাকত ছ্যাঁচড়ার কাঁটা, চচ্চড়ির ডাঁটা, পাত্‌লা ডাল ও পাথরের খোরায় পুঁটি বা মৌরলা মাছের তলানি অম্বল। তাই দিয়ে তৃপ্তি সহকারে খেতেন তাঁরা। শুনেছি কোনো কোনো বাড়ির গিন্নিরা এই সময় আনিয়ে নিতেন উড়িয়া দোকানের ফুলুরি। মায়ের রান্না আর বউয়ের রান্না নিয়ে বাংলায় অসংখ্য ছড়া চালু আছে। দুই বাংলার দুটি ছড়া তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারলুম না। প্রথমটি এপার বাংলার, 'লাউ করে হাউ হাউ কে রেঁধেছে ?/ আমি তো রাঁধিনি বাবা, বউ রেঁধেছে / আহা, তাইতো অভাগা লাউ মধু হয়েছে।' অন্যটি ওপার বাংলার ঢাকার,— 'মায়ে রাইন্ধে যেমন তেমন, বুইনে রাইন্ধে পানি/আবাগী যে রাইন্ধা রাখে চিনির টুকরাখানি।' খাওয়াদাওয়ার পাট শেষ হলে বিশ্রামের জন্যে অবেলায় একটু শুতেন গিন্নিরা—কেউ বা একখানি নবেল হাতে, কেউ বা রামায়ণ, মহাভারত নিয়ে। কমবয়সী মেয়ে-বউয়েরা দুপুরে গল্পগাছা করতে করতে সেলাইফোঁড়াই, নানারকম

এমব্রয়ডারি, সলমা চুমকি জরির টিপ নিজেদের কাপড়ে বসাতেন। এছাড়া কুরুসের লেস খুঞ্চেপোষ চটের ও কার্পেটের আসন বুনতেন, রবিবর্মার ছবিতে কাপড় পরাতেন, মিলের শাড়ির পাড় জুড়ে জুড়ে বাক্সের ঢাকা, কাঁথা সেলাই করতেন। রঙিন সুতোর ফুলপাতার নক্‌শা করে টেবিল-ঢাকা করাও রেওয়াজ ছিল। এখনকার মতো ঘরে ঘরে উলবোনার চলন হয়নি। হাতের কাজের মধ্যে আরও ছিল কাগজের ফুলমালা তৈরি, ঝিনুকের কাজ, পুঁতির কাজ, মাছের আঁশ দিয়ে ছবি আর সাজি তৈরি ইত্যাদি। এর জন্যে বিয়েবাড়ির দেড়/দু'মনি মাছের বড় বড় আঁশ খুব যত্ন করে ধুয়ে রাখা হতো। কোনো বাড়ির মেয়ে-বউয়েরা বসত দুপুরে তাস নিয়ে—গ্রাবু, বিন্তি এইসব খেলত। কেউ-বা বারো ঘুঁটির 'বাঘবন্দী' কিংবা কড়ি নিয়ে 'গোলকধাম' খেলতেন। তাঁদের অবসরের আর একটি কাজ ছিল সুপুরি কুচোনো। পানসাজা হতো সকাল বিকেল—কতরকমের দোক্তাজর্দার কৌটোই যে থাকত। আইবুড়ো মেয়েদের ওপর থাকত পান সাজার ভার। মায়েরা বলতেন চুন খয়েরের আন্দাজ থেকেই রান্নায় হাত খোলে! ছোট মেয়েদের একজন বুড়ো মাস্টারমশাই এসে একটু একটু করে পড়াতেন *সীতার বনবাস* আর *মেঘনাদবধ*। সকালবেলাতে এই পড়াশোনার পালা হতো। বিয়ের জন্যেই এই একটু-আধটু পড়ানোর চলন ছিল। তাই বই শেষ হতে না হতে ঘটকি এসে মেয়ে পছন্দ করত—পাকা দেখা, আইবুড়োভাত পর্ব শেষ করে বিয়ে হলেই বাপের বাড়ির পাট শেষ হতো। এই বিয়ের জন্যেই একটু গান শেখানোরও চলন ছিল। সন্ধেবেলায় গা ধুয়ে, চুল বেঁধে অল্পবয়সী মেয়েরা গান গাইত হারমোনিয়াম বাজিয়ে— 'তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে' বা এই গোছের কিছু। আর দু'একখানা রামপ্রসাদী গানও শিখে রাখত। খুব কম বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গানের চর্চা হতো। যারা *চয়নিকা* থেকে নিয়মিত কবিতা আবৃত্তি করত অনেকেই তাদের পাকা/জ্যাঠা/বিবি মেয়ে আখ্যা দিতেন। গোঁড়া বাড়ির মেয়েরা থিয়েটার করার কথা তখন ভাবতেই পারতেন না—আমার ছোটবেলায় দেখেছি দিদিরা ঘরের দরজা বন্ধ করে *বিদায়-অভিশাপ* ইত্যাদি আবৃত্তি করতেন অভিনয়ের মতন। আমি তাঁদের খুব খোসামোদ করতুম একটা পার্টের জন্যে। বিরক্ত হয়ে এক দিদি আমাকে আপাদমস্তক একখানি নীল শাড়ি জড়িয়ে শুইয়ে রাখলেন ও অভিনয়ের সময় 'এই সেই বেণুমতী' বলে আমার দিকে দেখালেন। ব্যস্, বর্তে গেলুম।

চারটে বাজলেই গিন্নিরা উঠতেন—শুরু হতো টুকিটাকি কাজ। ঝিকে দিয়ে ছাদ থেকে বড়ি, আচার বা আমসত্ত্ব নামানোর পর সেগুলো গুছোনো, রোগা-ভোগাদের ওষুধপথ্যের ব্যবস্থা করা। প্রায় সব বাড়িতেই দু'একজন রোগাভোগা বারোমাস থাকত। আর বারোমেসের দলে থাকতেন ঘর-জামাই, ছেমুটে (কম বুদ্ধি), বুড়ো-বুড়ি শ্বশুর বা শাশুড়ি, গণ্ডা দুই কুচোকাচা। এঁটো ভাত খাওয়া কাপড় কেচে, গা ধুয়ে, সন্ধে-প্রণাম করে আবার ঢুকতেন রান্নাঘরে। রাত দশটা পর্যন্ত চলত সেখানকার পাট। মেয়ে-বউয়েরা দেখত দুধের ভাগ—কর্তার ও জামাইদের ক্ষীর, ছেলেদের আধঘন,

আফিংখোরের দুধ ও কচি ছেলেদের পাতলা দুধ বাটিতে বাটিতে তুলে রাখতে হতো। এরই ফাঁকে ফাঁকে বয়ে চলত বারব্রতের উপোসের ধারা কিংবা পালপার্বণের উৎসবের পালা। কুটনো কোটার খুব আদর ছিল মেয়েমহলে। ধারালো বঁটিতে আলুভাজা কোটা হতো আশ্চর্যরকম সরু সরু করে। থোড়, মোচা, ডুমুর, কাঁচকলা, এঁচোড় এসব কুটতে হতো এমনভাবে যাতে আঙুলে দাগ না লাগে! গোটা বাঁধাকপি একহাতে ধরে পলকে কুচিয়ে ফেলতেন তাঁরা জিরে জিরে করে। এক আলুরই কত রকমফেরের কোটার চলন ছিল—ঝোলের, ডালনার, চচ্চড়ির, ভাজার আলাদা আলাদা রকমের কোটা হতো। কুটনো কোটার ওপরও ছিল কত ছড়া— 'তুমি কোটো চাল্‌তা আর আমি কুটি লাউ/ গতরখাকী বউকে দাও এঁচোড় মোচার ফাউ।' কিংবা 'তুমি কেমন বড়মানুষের ঝি/ তা কাঁচকলাটা কুটতে দেখে খোসায় বুঝেছি।' যৌথ পরিবারের ঝি-চাকরদের পরিবারের অঙ্গ হিসেবে দেখা হতো। বেশি পুরনো ঝি-চাকরদের প্রতাপও খুব হতো। বাড়ির ছোটদের শাসনের ও সহবৎ শেখানোর ভার তারা অনেকটাই নিজেদের হাতে তুলে নিত। তা বলে সোহাগেরও কমতি ঘট্‌ত না তাদের ব্যবহারে। আমাদের পরিবারে চল্লিশ বছর ধরে ছিল এমনই একজন। সবাইকার সে 'লক্ষ্মণদাদা'। আমাদের নিয়ে বেড়াতে বেরলেই নিজের পয়সায় খেলনা, পুতুল, বাঁশি, খাবারদাবার কিনে দিত। ছুটিতে দেশে গেলে ফেরার সময় দেশ থেকে প্যাঁড়া, খাজা ও আরও কত মেঠাই আনত। তাছাড়া বিচি-ছাড়ানো তেঁতুল, গাছের ফল, বাড়ির তৈরি আমচুর এইসব কত কি যে আনত! একবার সে মধুপুরের লোহার খেলনা এত এনেছিল যে তারই দু'চারটে পঞ্চাশ বছর পরেও বাড়িতে থেকে গিয়েছিল! আমাদের পুরনো ঝি গিরিবালা এক-গা গয়না পরে বাসন মাজত, বাটনা বাটত আর কথায় কথায় ছড়া কাটত। মেয়ে-বউদের ডেকে ডেকে কাজও শেখাত—কত কাজ যে সে শিখিয়ে গেছে! তার কাছেই শিখেছি শুধু মাছ কুটলেই হয় না, আরো কত কি চিনে জেনে রাখতে হয়, যেমন চিংড়িমাছের পিঠ থেকে কালো সুতো বার করা, ইলিশের পেট থেকে সতীর কয়লা, বামুনের পৈতে, টিকটিকির ন্যাজ বার করা ইত্যাদি। মুড়ি আর খই ভাজতে জানত সে। যে ছেলের কথা ফুটতে দেরি হতো তাদের মাকে গিরি বলত ভাজা খই মাটিতে পড়ার আগে লুফে নিয়ে ছেলেকে খাওয়াতে—ছেলের বোল ফুটবে তাড়াতাড়ি। নিকৃষ্ট জীবের প্রতি তার অহেতুক মমতা ছিল। ভাঁড়ারের আরশোলা, ইঁদুর মারলে সে দুঃখিত হয়ে বলত, 'ঘরকন্নায় অমন ইঁদুর বাঁদর সবই থাকে গো!' মা-কালীর পরেই ছিল তার মহারানীর প্রতি ভক্তি। ভিখারির দল সাধারণত রবিবারে আসত। তারা ছড়া কেটে আশীর্বাদ করত। মনে আছে এক হিন্দুস্থানী বুড়ি সুর করত— 'সুহাগ-ভাগ বনা রহে, বাল বাচ্চা ভালা রহে। বাবুকা গদ্দী বড়া রহে।' ওদের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই গিরিবালা বকত, ভয় দেখাত যে ওরা চুরি করে নিয়ে যাবে। এক মাঝবয়সী শক্তসমর্থ ভিখারিণী বলেছিল, 'আমি কি আজকের মানুষ গা? আমি হলুম গে বনেদী ভিখিরি। ওই মড়ুণ্ডে মালা হাতে নই। গেরস্তের কল্যাণের জন্যেই আমাদের আসা।' বছরে একবার

বদ্যিনাথ থেকে মিশিরজী আসত প্যাঁড়া আর মিছরি নিয়ে। পুরী থেকে পাণিগ্রাহী আসত বেঁটে লাল পাশবালিশের মতো লম্বা থলিতে মহাপ্রসাদ আর গজা নিয়ে। ভুবনেশ্বর থেকে গর্গবটু আনত এলাচদানা, 'কোরা' (সাদা শক্ত নারকোল নাড়ু) আর বিখ্যাত ঝাল মুড়কি।

আমাদের শোবার ঘরে না ছিল একটা খাট, না একটা আলমারি। ওইসব অতিথ-কুটুমকে নিয়ে প্রায় বিশ-পঁচিশজন মেয়ে শোবে কি করে ? বুড়িরা রাতে কেউ শ্বশুরের আমলের গল্প, কেউ দোল-দুর্গোৎসবের, কেউ বা বৃন্দাবন কি সাবিত্রী পাহাড়ের গল্প বারে বারে বলতে চাইতেন। কাপড়চোপড় নিয়ে কোনো মহলই তেমন মাথা ঘামাত না। আমাদের জন্যে পুজোর সময় রাশি রাশি বঙ্গলক্ষ্মী কিংবা মোহিনী মিলের নেহাত সাদামাটা ধুতিশাড়ি আসত। তাঁতের দামী ধুতিশাড়ি 'এক চড়নের' অর্থাৎ একসঙ্গে চারখানা বোনা এলেও বাড়ির ছেলেমেয়েরা তা পেত না, কুটুমবাড়িতে পাঠানো হতো সে-সব। তাঁতের শাড়ির তখন এমন বাহার ছিল না—লালকালো পাড় এদিক ওদিক করে হয় 'গঙ্গাযমুনা', নয় 'সিঁথির সিঁদুর'। বাড়ির ছোটদের জন্যে জামা আসত সব একধরনের—কর্তার তরফের ছেলেমেয়েরা বা পিতৃহীন অন্য তরফের ছেলেমেয়েরা একই জামা পুজোর সময় পরত। তা নিয়ে কখনও কারুর মনে ক্ষোভ ছিল না। তখনকার বিয়েতে এ যুগের আদিঅন্তহীন শাড়ি-সমুদ্রের দুই চার বিন্দু জলও ছিল না। খুব জাঁকের বিয়ে হলে দু'খানা বেনারসী, একটা করে ঢাকাই, শান্তিপুরী, নীলাম্বরী, টাঙ্গাইল বা ফরাসডাঙ্গার সঙ্গে খান দু'চার বাগেরহাটের ডুরে— ব্যস্ এই ছিল ঢের দেওয়া-থোওয়া। শ্রীযুক্তা জ্যোর্তিময়ী দেবীর মুখে শুনেছি যে তাঁর ঠাকুমার (জয়পুরের মন্ত্রী সংসারচন্দ্র সেনের স্ত্রী) তিনটি বেনারসী তিনটি তামার ঘড়ার মধ্যে থাকত। একটি ছিল তাঁর নিত্যদিনের পূজার শাড়ি, অন্যটি ছিল বাড়িতে বিয়ের সময় জামাই কিংবা বউ বরণের শাড়ি, আর তৃতীয়টি ছিল জরিদার ভারী শাড়ি, সেটি বাইরে কোথাও যাবার দিনে পরতেন। বোম্বাই, মাদ্রাজী, ও পার্শী শাড়িরও চলন ছিল। তবে সে উঁচুমহলে।

শীতকালে কাশ্মীর থেকে বেগুনী, কমলা, নস্যি ইত্যাদি রঙের ফুলদার গরম চাদর আনত কাবুলীরা। বাংলার ঘরে ঘরে এইসব চাদরকে তখন বলা হতো 'র‍্যাপার'। ফতুয়ার রেওয়াজ হবার আগে শীতে গায়ে দেবার জন্যে ছিল 'দোলাই' আর গরমের দিনে উড়ুনি। গেরস্তঘরে বিয়ের পর প্রথম বছরে নতুন জামাই পেত মাঝারি দামের একটি কাশ্মীরী শাল, তার পরের দু'বছর র‍্যাপার, চতুর্থ বছরে পাড়ওয়ালা ভালো সুতীর চাদর। তখন ধারণা ছিল যে কারুকে কিছু দিলে তা চারবার দিতে হয়। কেননা চারবারের এই দান ছিল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগের প্রতীক। যেমন গঙ্গায় ডুব দিয়ে স্নান করার সময় চারটে ডুব দিতেই হতো। এসব ছিল মেয়েলি শাস্তর। যৌথ পরিবারে বারোমাসের আত্মীয়স্বজন ছাড়াও মাঝেমধ্যে আসা-যাওয়ার 'লতাপাতার' জ্ঞাতিকুটুম্ব ছিলেন অনেক। আমাদের বাড়িতে এককালের ধনী দূর সম্পর্কের এক পিসিমা ফরাসডাঙ্গা থেকে আসতেন। তাঁকে আড়ালে বলা হতো 'ফরাসী পিসিমা'।

নিরক্ষরা এই পিসিমা সুন্দর গান বাঁধতে ও গাইতে জানতেন। প্রথম দিনে খাওয়ার পরে তাঁকে পানের খিলি দেওয়াতে বলেছিলেন— 'ওমা ! আমি কি ব্যাটাছেলে নাকি ? আমার জন্যে বাটা আনবি। নিজের চুন জর্দা নিজে নেব। আমাদের বউ খেটে মরে কিন্তু কাজের ঠাঁট্ জানে না—বড্ডো গেরস্থালি ভাব।' জলখাবারে লুচির সঙ্গে এ বাড়ির চিনি তাঁর চোখে ময়লা ঠেকায় তিনি মিশ্রী গুঁড়িয়ে দিতে বলেছিলেন, 'লুচির পাতে দিলেম চিনি/মেঘের-কোলে সৌদামিনী।' পিসিমা বলতেন, 'তোদের পিসে বলেছিল কলকাতার বাবুদের কেনাকাটার জায়গা তো মোটে তিনটি—আরমিনের (আর্মি অ্যাণ্ড নেভি), লেডেলার (হোয়াইটওয়ে লেড'ল) আর আণ্ডের সেনের দোকান। আর আমাদের চন্দননগরে গোটাটাই ঝলমলে বাজার— পয়সা ফেলতে জানলেই হয়।'* সম্পূর্ণ অন্য ধরনের আর একজন ছিলেন কাশীর পিসিমা— কোবরেজী টোট্কার একটি চলন্ত অভিধান। নিজে নিজে বহু তীর্থে ঘুরেছিলেন, সাধু দেখেছিলেন পেল্লায় পেল্লায়। উচিত অনুচিতের ব্যাখ্যা করতেন বলে আড়ালে তাঁকে বলা হতো 'বিধান পিসিমা'। ঝুলন পূর্ণিমার দিনে রাখী হাতে দলবেঁধে রাঁধুনী বামুনেরা আসত। টাকা, আধুলি, সিকি ছিল তাদের বাৎসরিক পার্বণী। পিসিমা বলতেন, 'ওগো বউ, বামুনের হাতে কাটা পৈতে একটা করে ওইসঙ্গে ওদের দিও।' নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ বিধবা দুপুর বেলা চরকা ঘুরিয়ে সুতো কেটে যে পৈতে করেন তা দান করতে পারলে হবে অক্ষয় স্বর্গবাস— এ ধারণা অনেকেরই ছিল। তবে তা জোটানো 'বাঘের দুধ' পাওয়ারই সামিল। আমাদের খুড়তুতো দিদি অল্পবয়সে বিধবা হবার পরে কাশীর পিসিমাই তাকে শাড়ি ছাড়িয়ে থান-ধুতি পরালেন। বলতেন, 'নিষ্টে-কিষ্টে না হলে কি বিধবা মানায় ?' তখন অন্য দিদিদের সবার খুব রাগ হয়েছিল। একবারও মনে পড়েনি যে পিসিমাকে এগারো বছর বয়সে বিধবা হয়ে থান ধরতে হয়েছিল। আমাদের ঠাকুরঘরের পিদ্দিমে ছেঁড়া কাপড়ের সলতে দেওয়া হতো। বিধান পিসিমা বললেন, 'ছিঃ ছিঃ বউ, ঠাকুরঘরে তুলোর সল্তে দিতে হয়, কাপড়ের সল্তে অশুচি। পুরীর পাণ্ডাকে বলে দিও—একটাকায় এত সল্তে দিয়ে যাবে যে সোমবচ্ছর চলবে। কাশীর নাগোয়ার পেল্লাদের মন্দির থেকে আদি কেশব অব্দি বিলি কেটে কেটে আমি সাধু দেখেছি। আমায় আর পুজো-আচ্চা শিখিও না বাছা।'

গেরস্তবাড়ির সদর উঠোন শুধু অতিথি কুটুম্বের জন্যে নয়, ফিরিওয়ালাদের জন্যেও খোলা থাকত। তাই সাড়া না দিয়েই আসত দুপুরে রেশমি চুড়িওয়ালী, পুরোনো কাপড়ের বদলে জাপানি কাপডিশ, বাসনে নাম লেখাবেন ইত্যাদি। সন্ধে হলে আসত কুলপী বরফ আর বেলফুল। খাঁটি ঘি, ঘট্কি, পুরনো ধাইমা, বষ্টুমী এদের সবার ছিল অবারিত দ্বার। প্রতি শনি-মঙ্গলবার সন্ধেবেলায় আসত দাড়িওয়ালা 'মুস্কিল আসান'। তাঁর ঝাড়ন মাথায় বুলিয়ে সব রোগবালাই দূর করে দিত। পাঁচ পয়সায় সে আবার মৌলালীর'

দরগা থেকে জলপড়াও এনে দিত। তাঁতী-বৌ আসত তার কাপড়ের গাঁটরি নিয়ে। বিকেল হলেই রাস্তার মোড়ে অবাক জলপান নকলদানা নিয়ে ফেরিওয়ালা আসত একপায়ে ঘুঙুর বেঁধে। আলুকাবলি ঘুগনিওয়ালার মাথায় থাকত মস্ত ঝাঁপ—একপয়সার আলুকাবলি আমরা জনা দুই-তিন মিলে চেটে চেটে খেতুম পাতায়। চিনির লিচুওয়ালা, বুড়ির চুল, একপয়সার বায়স্কোপ, কাগজের ফুল বা বাঁশিওয়ালা—এদের জন্যে কত ছেলেমেয়ে যে পুজোর ঘরের জলচৌকি থেকে পয়সা চুরি করত! একান্নবর্তী কলকাতার গেরস্থালীর কথা কি যে বলি আর না বলি। দিদির শাশুড়ি বলতেন— 'কথা কইতে জানলে হয়/কথা শতধারে বয়।' তিনি ছিলেন কোন্নগরের মিত্তিরবাড়ির মেয়ে, শ'য়ে শ'য়ে বড়ি দিতে আর তিনমাস ধরে আমসত্ত্ব দিতে মজবুত। আমের সময়ে রোজ একশো দেড়শো আম চিনি দিয়ে ফুটিয়ে ছেঁকে, ঘি-মাখা পাথরে, কাঁসায় বা কাঠের পরাতে, কলাপাতায়, শেতলপাটিতে, ছাঁচে আর অশথ্ পাতায় ঢেলে দেওয়া হতো কোনোটা একপাটে, কোনোটা বা তিনপাটে। কাগ্‌তাড়ুয়াদের জন্যে একখানা 'এঁটোসত্ত্ব' প্রত্যেকদিন দেবার নিয়ম ছিল। তাঁদের আমসত্ত্ব আমাদের বাড়ি এলে জ্যাঠতুতো এক দাদা বলতেন, 'অটম্ স্পেশাল, সাক্ষাৎ শরৎশশী (দিদির শাশুড়ির নাম) ব্রাণ্ড।'

পোষমাসের পিঠে পরবটাও ছিল খুব জমকাল। সেইকটা দিন ঘরে ঘরে মেয়েদের চুল বাঁধার সময়ও মিলত না, যেমনটি ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর কবিতায় বলে গেছেন ঠিক তেমনই। খুব গরিবের ঘরেও সেদ্ধপিঠে, সরু-চাক্‌লি, পাটিসাপ্‌টা, পায়েস আর অন্যরকম পিঠে হতো সেকথা আমরা কত ছোটগল্পে পেয়েছি। বিশেষ করে মনে পড়ে বিভূতিভূষণের 'পুঁইমাচা' গল্পটি। ভূতচর্তুদশীতে চোদ্দ শাক, শীতলাষষ্ঠীতে গোটাসেদ্ধ, পাড়াসুদ্ধ ভাগ করে খাওয়া হতো। এই খাওয়া নিয়ে গল্পের আর ছড়ার টুকরোও আছে। বাউনি (মকর সংক্রান্তির আগের দিনের নাম) সংক্রান্তি আর পয়লা মাঘ এই তিনদিনের পিঠের ভাগ শেয়ালকেও খাওয়াতে হতো! শহর কলকাতায় শেয়াল দুর্লভ—তাই পাঁদাড়ের পথের কুকুরকে খাওয়ানো হতো। ঘরে-ঘরে সে ক'দিন মেয়েদের রান্নার পাট প্রায় হতোই না, পিঠে খেয়েই পেট ভরত। যে যত খেতে পারবে তাকে তত দিতে হবে, এই নিয়ম ছিল। কেননা বাড়ি বাড়ি পিঠে খাবার নেমন্তন্ন হতো। আর ছিল বারমেসে আচার, চাট্‌নি, বড়ি করার চলন। গেরস্তপোষা দু'একটা জিনিস সব ঘরেই করে রাখা হতো—যেমন আমসি, আমচুর, রসকুল, কুলচুর, ছড়া বা গোলা তেঁতুল। তাছাড়া আমড়া, জলপাই, চালতা, করমচা, লঙ্কা, এঁচোড়, সজনে-খাড়া, ওল এইসবের আচার চাটনি হতো সরষের তেল বা সামান্য গুড় দিয়ে খোরাখোরা। এসব জিনিস হতো আর এসবের টাক্‌না দিয়ে বেড়াল-ডিঙুনো ভাত গলায় নামত! ডাল ভিজিয়ে বেটে যে কত রকমের বড়ি দেওয়া হতো—পোস্ত বা হিং মিলিয়ে তাতে কত রকমফের আনা হতো! আমাদা, কিস্‌মিস্, কাঁচা আম দিয়ে 'এ'-কেলাসের চাটনি ও জেলি। এগুলো বিলিতি আচার। রুগীদের জন্যে নানারকমের মোরব্বা—কলা, বেল (যাতে বিচি ও আঠা হয় না), আমলকি, গুলকন্দ ইত্যাদির। গুড়ের জন্যেই নাকি গৌড়দেশের খাতির।

গুড়ে-ঘোষ, গুড়ে-মুখুজ্যে বলে দু'চারটি পরিবারের সুনাম ছিল তাঁদের অপরিসীম গুড়-ভক্তির জন্যে। শীত পড়তেই পয়রা ও নলেন গুড়ের গন্ধ নাকে আসত। ঠাণ্ডা জাঁকিয়ে পড়লে তবেই ভালো পাটালি হতো। কুটুমবাড়িতে নাগরীভরা রসালো খেজুরগুড়, লালকালো পাটালি, সরাগুড়, খুরি গুড়, নতুন গুড়ের মুড়কি, মোয়া আর সন্দেশ পাঠাবার রেওয়াজ ছিল সবারই। বেলেঘাটার খালে নৌকা-বোঝাই হাজার হাজার কমলালেবু আসত সিলেট থেকে—সেগুলো কিন্তু কুটুমবাড়ির তত্ত্বে পাঠাবার মতো জাতে ওঠে না—তাই বাড়ির ছোটরা ফেলাছড়া করে খেতে পেত।

কুটুমেরা তত্ত্বে উজ্জ্বল কমলা রঙের বড় বড় লেবু, পাতাসুদ্ধ ফুলকপি, কড়াইশুঁটি এইসব না পেলে ভারী ব্যাজার হতেন। বছরে দশবারো রকমের তত্ত্ব পেয়েও তাঁদের মন উঠত না। তীর্থ করে এলেও কুটুমবাড়িতে গয়ার পাথরের নয়তো ক্ষিত্তুরে বাটি, কটকি কিংবা জাজপুরি কাঁসি দিতেই হতো। সিধু ঘটকের মুখে শোনা একটা ছড়া মনে পড়ল— 'জষ্টি মাসে আম কাঁঠাল/আষাঢ় মাসে ইলিশ/ভাদ্দর মাসে তালের তত্ত্ব/পুজোয় কুটুম পালিশ/অঘ্রান মাসে শাল দোশালা/পোষে গুড়ের নাগরী/ফাগুন মাসে দোলের তত্ত্বে পিচ্‌কিরি আর পাগড়ি।' রসরাজ অমৃতলাল লিখেছিলেন— 'কলকেতায় কোনো মেয়ের বাপ জামাইবাড়িতে পোষড়ার তত্ত্বে একেবারে দশবারোটা খেজুর গাছ আস্ত তুলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সব গাছগুলোর গলা ধরে এক একটা জ্যান্ত শিউলি (যে রস পাড়ে) ঝুলছিল।' এমন নৈলে—এই শহরে জন্মে দীর্ঘজীবন নিয়ে আমরা তো এখানেই আছি, তবু মনে হয় পুরনো কলকাতার কতটুকুই বা জানি! হাটখোলার যমদত্ত [যতীন্দ্রমোহন দত্ত] বলতেন, 'সন্দেশ যত ছোট হচ্ছে বাঙালীর মাথার ঘিও তত কমছে।' খাস কলকাতায় সন্দেশ কিনতে গিয়ে একবার কি দুঃখ ভোগ করেছিলাম তা বলি শুনুন। অনেকদিন আগে দিব্যি আহ্লাদ করে বেলেঘাটা থেকে দর্জিপাড়ায় ছুটে গিয়ে এক বিখ্যাত ময়রার দোকানে বলেছিলুম দুদিন রেখে খাওয়া যায় এমন ভালো সন্দেশ দিতে। বুড়ো কর্তা হাঁ হাঁ করতে করতে এসে আপাদমস্তক আমাকে দেখে বলেছিলেন, 'কোলকাতার কোথায় থাকেন? বলছেন দু'দিন রেখে আমাদের সন্দেশ খাবেন! ঘন্টা দু'তিন গেলেই এর স'দ, গন্ধ বদলে যায়। এ জিনিসটি থির হয়ে বসে তোকাতুকি খেতে হয়—একটু চেখে দেখুন দিকি, ওই গরম কড়া নেমেছে। মুখে না রুচলে হরি ঘোষ, ভীম ঘোষ পেরিয়ে গুহদের কালীবাড়ি অবধি কান ধরে নিয়ে যাবেন।'

এবার যৌথ পরিবারের দু'জন অধ্যাপকের কথা বলে আমার স্মৃতির ঝাঁপির ডালা টেনে দেবো। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর দেশ মুর্শিদাবাদের জেমোকান্দী। প্রতিবছর সেখান থেকে দলবেঁধে লোক আসত কলকাতার কালীঘাটে পুজো ও গঙ্গাস্নান করতে। তাঁর নাতি লালগোলার ধীরেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতিকথায় লিখে গেছেন যে একবার এইরকম জনা চল্লিশ অতিথিদের কাপড় শুকুতে দেওয়া ছিল বারান্দায়। পড়শীদের দুষ্টু ছেলে মজা দেখবার জন্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এই লঙ্কাকাণ্ডের খবর শুনেও অধ্যাপক নির্বিকার ছিলেন। দুষ্টের দমন না করে তিনি বিপন্ন অতিথিদের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ক্ষতি তাঁকে বিচলিত করেনি। এইরকম সহনশীলতার আরেকটি উদাহরণ অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া। আশ্রিত অতিথি, কুটুম্ব, অনাত্মীয় বন্ধু, পরিচিতে সর্বদা ভরা থাকত তাঁর বাড়ি। তাঁর নাতিনাতনিরা বলেন যে একাধিকবার মাঝরাতে হৈচৈ শুনে জেগে উঠে তাঁরা দেখেছেন বাড়িতে কার-না-কার বিয়ে হচ্ছে। কন্যাকর্তাকে অধ্যাপক বলছেন— 'তোমার ভাবনা কিসের ? আমার বাড়ি তো রয়েছে।' এমন সদাব্রত তখন অনেক পরিবারেই ছিল। তাই তো তখন জীবন ছিল সহজ। যৌথ পরিবারের চাকাও তাই মসৃণভাবে গড়িয়ে চলত। এইসব বাড়িকে এখনকার দিনে ক্লাব, হোস্টেল বা ধর্মশালা যা ইচ্ছে ভাবা যেতে পারে বই-কি।

দেশ, ৩১ অক্টোবর ১৯৮৭

সংজ্ঞা দেবী/সাধুমা স্বরূপানন্দ সরস্বতী

সংজ্ঞা দেবী সম্বন্ধে কিছু কিছু ভালো লেখা এদিক-ওদিকে বেরিয়েছে, তবু আমার তরফে বলি যে তাঁকে নিয়ে প্রথম আলোচনা বিমল বসু-পরিচালিত *মহিলা-মহল* কাগজে আমিই করেছিলুম।[১] তাঁর আত্মকথা 'সেবিকার কৈফিয়ৎ' নাম দিয়ে *মহিলা মহলে* ধারাবাহিক বের করা হয়,[২] আর সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭২-১৯৪০) সম্বন্ধে তাঁর লেখা যোগেশচন্দ্র বাগলের ব্যবস্থায় *প্রবাসীতে* বের হয় বোধহয় ১৯৫৯ সালে।[৩] দুঃখের বিষয় সেইসব লেখাই আজ হাতের কাছে নেই। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষে গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষ চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৯৭২ সালে যে বই বেরোয়[৪] তাতে সংজ্ঞা দেবী 'ওঁকে যেমন দেখেছি' নামে সাঁইত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনের দ্বিতীয়বার স্মৃতিচারণ করেন।[৫]

১৯৫৭ সালে ভুবনেশ্বর বেড়াতে গিয়ে নিম্বার্ক আশ্রমে উঠি। ওখানকার আরতি, বিগ্রহের সাজসজ্জা আর পালাকীর্তন বিখ্যাত ছিল। সন্ধে হলেই ভিড় জমত। মন্দিরের সিঁড়ির ওপরে মস্ত লম্বা টর্চ রেখে একজন পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকতেন, দু-আড়াই ঘন্টা সময়ের মধ্যে ওঠা-বসা তো দূরের কথা, কোলের ওপর রাখা হাতখানিও নাড়তেন না। আরও কোনো কারণে আমার মনে হল ঐ মূর্তি ঠাকুরবাড়ির হওয়া সম্ভব। শহরের মান্যগণ্য বহু ব্যক্তি আসতেন খোঁজ নিতে। একজন তো বলে বসলেন— 'উনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী!' যাই হোক, নাছোড়বান্দার মতো লেগে থেকে ওঁর ঠিকানা পেয়ে দিন-দুই বাদে ওঁর সন্ধানে বেরিয়ে আস্তানা খুঁজে পেলুম। তখনকার মন্ত্রী শচীনন্দন মিশ্রের আউট হাউস ; মানে দু'খানা নিচু-নিচু ঘর।

কোনোকালে সেই গোয়ালে গোরু ছিল, তখনো একটা ঘর ঘুঁটে আর খড় বোঝাই, অন্যটায় সাধুমা। যেমন তেমন একটা প্যাকিং বাক্সের তক্তপোষে গেরুয়া কাপড় পাতা, কোণে দড়ির আলনা আর টেবিলের মতো একটাতে একটা ঘড়ি আর খুচরো কী সব যেন! ১৯১৮ সালে স্টোর রোডের বাড়ি বিক্রির পুরো গল্প আমার শোনা ছিল। তাই ওই ঘুঁটের ঘরের পাশে সাধুমাকে নির্বিকার প্রশান্তমুখে বসে থাকতে দেখামাত্রই আমি তাঁর ভক্ত হয়ে পড়ি। আমাকেও বহুকালের পরিচিতের মতোই তিনি গ্রহণ করেন— পূর্বাশ্রমের কথা সন্ন্যাসীকে বলতে নেই, অথচ প্রতিদিন গিয়ে তাঁর পূর্বাশ্রমেরই খোঁজ নিয়েছি। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত আমার সঙ্গে খুব নিয়মিত যোগ ছিল।

সংজ্ঞা দেবী বা সাধুমার মনটি ছিল ঈশ্বরপ্রেমে ভরা অথচ আমার মতো সংশয়ী, সংসারী না হয়েও বিষয়ী ব্যক্তির সঙ্গে হয়তো গভীর বৈপরীত্যের কারণেই একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল।

প্রিন্স দ্বারকানাথের সহোদর রাধানাথের পৌত্র ছিলেন সংজ্ঞার মাতামহ। তাঁর মা ইন্দিরা দেবী *আমার খাতা* নাম দিয়ে একটি ছোট আত্মজীবনী প্রকাশ করেন।[৬] যতদূর জানি এটি পুনরায় আর প্রকাশিত হয়নি। সংজ্ঞার বাবা প্রিয়নাথকে দেখামাত্রই মহর্ষি তাঁকে তাঁর সঙ্গী আর শিষ্য করে নেন। এই আশ্চর্য কাহিনী বলতে সংজ্ঞা ভালোবাসতেন। মহর্ষি গঙ্গার বুকে বজরা নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে সাহেবগঞ্জে আসেন। সেখানে কয়েক ঘন্টা কাটালেন *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার গ্রাহক ধার্মিক প্রিয়নাথের সঙ্গে। তারপর তাঁকে চাকরি ছাড়িয়ে সঙ্গে করে বাড়ি আসেন। কাশী থেকে পণ্ডিত আনিয়ে তাঁকে উপনিষদ আর শাস্ত্র পড়িয়ে শাস্ত্রী উপাধি দেন। তারপর মহর্ষিই প্রিয়নাথের বিয়ে দেন ইন্দিরার সঙ্গে। ইন্দিরাকে পরে তিনি 'দেবী' বলে উল্লেখ করতেন। প্রিয়নাথই মহর্ষির দেহান্তের সময় প্রথম ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করেন। তাছাড়া মহর্ষির *আত্মচরিত* আর চিঠিপত্র প্রকাশের সব দায়িত্বও প্রিয়নাথই নেন।

এদিকে সুরেন্দ্রনাথ একমাত্র সন্তান বলে তাঁর মা জ্ঞানদানন্দিনী কিছুতেই তাঁকে বিলেত যেতে দেননি। অভিমানে সুরেন্দ্রনাথও বিয়ে করবেন না বলে দেন। তিরিশের কাছে বয়স এলে তিনি নিমরাজী হতেই চারিদিকে পাত্রীর খোঁজ পড়ে গেল। এই সময় একদিন সংজ্ঞা নিজের ভাইয়ের পৈতে উপলক্ষে ওঁদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতে গেলেন। প্রমথ চৌধুরী মশায়ের ঐ টুকটুকে মেয়েটিকে দেখে খুব পছন্দ হল। তিনি জ্ঞানদা দেবীকে বললেন— 'এই তো মিসেস টেগোর, এমন সুন্দরী মেয়ে পেয়েছেন, একেই বৌ করে নিন।' শাশুড়িকে চৌধুরীমশাই বরাবর মিসেস টেগোর বলতেন আর সংজ্ঞাকেও চিরদিন খুব ভালোবাসতেন। ডাকতেন বৌ বলে। গল্পগুজবও করতেন। সংজ্ঞাও ঠাকুরজামাইকে বরাবর 'তুমি' বলতেন।

সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সংজ্ঞার বিয়ে হচ্ছে জেনে মহর্ষি খুব সুখী হন, তাঁর ক্যাশিয়ারকে বলেন : 'তুমি বাক্স নিয়ে বিয়েবাড়ি (কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ি) যাও। দেবী যখন যেমন বলবেন সেইমতো টাকা তখুনি দেবে।'

বিয়ের পরেই সংজ্ঞাকে শ্বশুরবাড়িতে পরিচিত করাবার জন্যে জ্ঞানদা দেবী নিজের বাড়ি ছেড়ে জোড়াসাঁকোয় এসে মাসখানেক থাকেন। ছোট্ট বারো বছরের মেয়েকে ইংরিজি শেখাবার জন্যে লোরেটোর একজন মেম রাখা হয়, রেবাচাঁদ নামে একজন সিন্ধী এবং আরও একজন পড়াতেন। তাছাড়া সুরেন্দ্রনাথও গভীর মমতা ও স্নেহের সঙ্গে তাঁকে মোটামুটি শিক্ষিত করে নেন। শিলাইদহে বেড়াতে গিয়ে একটি বড় জাপানী গল্প ইংরেজিতে পড়ে সেটি অনুবাদ করে সংজ্ঞাকে মস্ত এক চিঠি দেন। *একটি বসন্ত প্রাতের প্রস্ফুটিত সকুরা পুষ্প*[৭] বইটি জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে। শ্বশুর সত্যেন্দ্রনাথও নিয়মিত ইংরেজি কবিতার আবৃত্তি শেখাতেন তাঁকে। মাথায় ঘোমটা দিতে দিতেন না। ও-

বাড়ির বড় বউঠাকুর শুনে একদিন বললেন : ও আবার কী! কেন গগনেন্দ্রনাথ সমরেন্দ্রনাথ এভাবে বললে তবে তো বোঝা যাবে।

সত্যেন্দ্রনাথ মোটেই হিসেবী ছিলেন না। অপরিমিত ব্যয়ের জন্য সে-যুগেও কুলিয়ে উঠতে পারতেন না। উনিশ নম্বর স্টোর রোডের বাইশ বিঘের ঐ বিশাল বাড়ি তিনি মহর্ষির দেওয়া টাকাতেই কিনেছিলেন—যে বাড়িতে দুটো মস্ত পুকুর, একটা দীঘির মতোই পদ্মফুলে ভরা, তাতে বোটে চড়ে বেড়ানো হতো, অন্যটায় গাড়িসুদ্ধ উলটে পড়ে কোনো সাহেব মারা যায় শোনা গিয়েছিল। সে আবার নাকি ভূত হয়ে ভয় দেখাত! গাছ ভর্তি ছিল কাঠবাদামে। জ্ঞানদা দেবী ঠোঙা ভরে ভরে ছোটদের নাম করে পাঠিয়ে দিতেন। আট বছরেব গাঁয়ের মেয়ে এসে নিজের চেষ্টায় অদম্য উৎসাহে নিজেকে অসাধারণ গুণবতী করে গড়ে তোলেন। শ্বশুরবাড়িতে কারো অসুখ করলে নিজের সংসার ফেলে সেখানে সেবা করতে ছুটে যেতেন। সুরেন্দ্রনাথের চারটি ছেলে আর দুই মেয়েকে জ্ঞানদাই বড় করেছিলেন, তাদের সেবাও করেছেন। বাড়ির ছেলে-মেয়েদের জন্মদিন পালনও বোধহয় জ্ঞানদাই প্রথম শুরু করেন। শ্রাবণ মাসে সুরেন্দ্রনাথের জন্মদিনে বাড়ির ভৃত্যেরা (সংখ্যায় বাইশ বা তেইশ) প্রত্যেকে একটি ভালো ছাতা পেত আর ইন্দিরার জন্মদিনে শীতকালে পেত গরম কম্বল। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়বর্গকে ঘটা করে খাওয়াতেন। পদ্মপাতায় খাবার পরিবেশন করা হতো। ছেলেদের জুটিয়ে আবৃত্তি অভিনয় আরও নানা উৎসব করাতেন। বাপ-মাকে ও ভাইকে কাছে এনে ঐ জমিরই এক পাশে বাড়ি তৈবি করে দেন। খরচের ঠেলায় তাঁর বিস্তর দেনা হয়ে যায়। রাঁচীতে বাড়ি করে দিতে বলেন সুরেন্দ্রনাথকে। সেখানে থাকবেন, ভাড়াও দেবেন, ধার শোধ হবে। নাম পছন্দ করলেন 'ছাতুর হাঁড়ি'। সুরেন্দ্রনাথ আটকোণা মস্ত থামওয়ালা ঘর করলেন। প্রতি থামের মাথায় একটি করে হাঁড়ি বসানো, দু'সারি ঘর আর বারান্দা দুই পাশে। এত সুন্দর বাড়ি হল যে সত্যেন্দ্রনাথ আর ভাড়া দিতে দিলেন না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর সত্যেন্দ্রনাথ দুজনেই রাঁচীতে থাকতেন। মোরাবাদী পাহাড়ের ঠিক চুড়োয় চারটি থামের ওপর একটি ছাত বসিয়ে সেইটে উপাসনা মন্দির করেছিলেন। বাবার সম্পত্তি পাননি, মাসোহারা পেতেন জ্যোতিরিন্দ্র। তাঁর একটি নিজের রিক্‌শা ছিল আর দুটি চাকর—রিক্‌শাও টানত তারাই। পাহাড়ের ওপরে জলও টেনে তুলত। তিনি রোজ সকালে রিক্‌শা করে বেরুবার সময় পাহাড়ের নিচের মানুষদের কার কী চাই লিখে নিতেন। ফেরার সময় বাড়ি-বাড়ি সেটা পৌঁছে দিয়ে স্নান-খাওয়া করতে করতে আড়াইটে-তিনটে বাজত। তারপর ইজিচেয়ারে শুয়ে বিশ্রাম, রাতে আর খেতেন না। গভীর ভাবে যেন মগ্ন থাকতেন।

রাঁচীতে একদিন দুপুরের রোদে পাহাড়ে উঠেই নেমে এসে সংজ্ঞাকে বললেন—'সংজ্ঞা, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ?' হতবুদ্ধি সংজ্ঞা কী করে তাঁকে ডেকে পাঠাতে পারেন? সবটা চাকরের ভুল বুঝতে পেরে হাসতে হাসতে আবার উঠে গেলেন। একটুও অসন্তোষ কোথাও ছিল না তাঁর। সুরেন্দ্রনাথ যখন যা করতেন তা চরমভাবে

করবার চেষ্টা করতেন। নিজে অনেকদিন জ্বরে ভুগে প্রতাপ মজুমদারের দু'ডোজ ওষুধ খেয়ে সেরে গেল দেখে সেই থেকে হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস হল। খুব পরীক্ষা করতেন। একটি ভয়ংকব পরীক্ষার কথা সংজ্ঞা বলেছিলেন। তাঁর মেজ ছেলে প্রবীরের টাইফয়েড হয— নিজেই ওষুধ দিতেন। জ্বর বাড়ছে দেখে রোজ বড় ডাক্তার ডাকতেন, তাঁর কাছে রোগীর বুক ও পেটের খবর জেনে নিয়ে লিখে রাখতেন, ওষুধ দিলেও সে ওষুধ খাওয়াতেন না। নিজের ছেলের টাইফয়েডে নিজের বইপড়া বিদ্যের ওপর শেষ পর্যন্ত ভরসা রেখে রোগী ভালো করে তুলেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের স্বাদেশিকতা আর বিপ্লব আন্দোলনের অতি ঘনিষ্ঠতা এসব সংজ্ঞা দেখেননি, শুনেছিলেন মাত্র। তবে নিবেদিতাকে দেখেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সংজ্ঞাকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পরও ওকাকুরা আর সুরেন্দ্রনাথ সিস্টারের কাছে যান। মনীষী ওকাকুরা ভাড়া বাড়ি ছেড়ে স্টোর রোডের বাড়িতে চলে আসেন। সুরেন্দ্রনাথের ছেলেকে দেখবার জন্যে এমন-কী তিনি রাঁচীর বাড়িতেও যান। ওকাকুরার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের মারফৎ গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্রের যোগাযোগ হয়। ওকাকুরা সামুরাই পরিবারের বিখ্যাত 'তরবারি'— যা কখনো পরিবারের বাইরে যায় না সেটিও সুরেন্দ্রনাথকে প্রীতি-নিদর্শন হিসেবে দেন।

সুরেন্দ্রনাথের ছবি আঁকা আর গান-বাজনাতে ঝোঁক ছিল। গানের গলা তেমন ছিল না হয়তো, কিন্তু এসরাজের হাত ছিল চমৎকার, আর ছিল গভীর সুরবোধ। বহু বিষয়ে লিখেছেন। তাঁর 'রাগ ও মেলডি'[৮] আর 'বাংলার বেখাপ বর্ণমালা'[৯] বিখ্যাত লেখা। অনুবাদকর্মেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত—রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধ, *জীবনস্মৃতি*, *ঘরে-বাইরে* আর *চোখের বালির* অনুবাদ সুরেন্দ্রনাথেরই করা। সব ব্যাপারেই তিনি কবির ভরসাস্থল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বহু চিঠি লিখেছিলেন সুরেন্দ্রনাথকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় একখানিও রক্ষিত হয়নি। নিজেও বেশি কিছু লিখে যাননি। *সকুরা পুষ্প*, *মহাভারতসার*[১০] আর শেষ জীবনে সোভিয়েট কর্মযজ্ঞ নিয়ে *বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ*[১১] তিনটি মাত্র বই সুরেন্দ্রনাথের।

কর্মজগতে তাঁর প্রধান কীর্তি হিন্দুস্থান ইন্‌শিওরেন্স। পরিকল্পনায় পাটনার অধ্যাপক অম্বিকা উকিল, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী থাকলেও প্রথম দিন থেকে প্রাণপাত পরিশ্রম করে হিন্দুস্থানকে মহীরুহতে পরিণত করার সমস্ত কৃতিত্ব সুরেন্দ্রনাথের। এই ইন্‌শিওরেন্সের বোঝা কাঁধে থাকাতেই তিনি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিতে পারেননি। দেশবন্ধু তাঁকে কর্মী হিসেবে নলিনীরঞ্জন সরকারকে এনে দেন। তাঁকে প্রথমে সুরেন্দ্রনাথ তিরিশ টাকার কেরানি করে নেন। বুদ্ধিমান ছেলেটিকে খুব অনুগত দেখে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে থাকেন ছাত্রের মতো করে। ছাত্রের ছিল গুরুমারা বিদ্যে, তাছাড়া প্রতিভাও ছিল বটে। একদিন তিনি হিন্দুস্থানের জেনারেল ম্যানেজার হলেন। সুরেন্দ্রনাথের সরলতার আর বিশ্বাসের জন্যেই এমনটি হয়েছিল। যদি কেউ বলত, 'তোমার মাথায় চড়ব', তাকে বলতেন : 'দাঁড়াও, তোমায় মইটা এনে দিচ্ছি।' এসব কথা সেকালের লোকে সবাই জানেন।

দেনার দায়ে বাড়ি বিক্রি হয় ১৯১৮ সালে। সকালবেলা বালিগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাবে গিয়ে একটু বসতেন। (তাঁর আর্থিক দুর্গতির কথা ভেতরে ভেতরে অনেকে জানতেন)। সেদিন জি. ডি. বিড়লা পার্কের বেঞ্চে এসে পাশে বসলেন। সুরেন্দ্রনাথই নানা কথার পর বললেন বাড়িখানা এবার বেচে ফেলবেন। বিড়লা প্রশ্ন করলেন— 'কত দাম আশা করেন ?' সুরেন্দ্রনাথ বললেন— 'তা তিন-চার লাখ টাকা তো পাবই', তৎক্ষণাৎ উনি চার লাখ টাকা দেবেন বলে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মৌখিকভাবে পাকা কথা কয়ে নিলেন। বাড়ি ফেরবার পর থেকে ক্রমাগত বড় বড় খরিদ্দার আসতে লাগলেন, একজন তো আট লাখ টাকা দেবেন এবং আরও দিতে পারবেন বললেও সুরেন্দ্রনাথ জেদ করে নিজের কথার মর্যাদা রাখবার গোঁ ধরে বসে রইলেন। শোনা যায় এতে নানারকম নিন্দাবাদ রটেছিল বিড়লা শিল্পপতির নামে। সংজ্ঞা বলেছিলেন এতবড় ঘটনাতেও তিনি ভেঙে পড়েননি। অসামান্য ঐশ্বর্যের মধ্যেও তাঁর (সংজ্ঞার) ভোগ বা অর্থের প্রতি কোনো লোভ ছিল না।

জন্মসূত্রে বৈরাগ্য আর ঈশ্বরলাভের আকুলতা তাঁর ছিল। বিয়ের পর কিছুকাল সংসার নিয়ে থাকলেও ক'বছর বাদেই সাধুদর্শনের নেশা তাঁকে পেয়ে বসল। মোটর নিয়ে রাত বারোটায়ও নির্জন সিরিটি শ্মশানে সাধু দেখতে গেছেন। স্বামীর মত না নিয়েই তিনি সচ্চিদানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। অথচ সেই গুরুর আশ্রমে কাশীতে যাবার সমস্ত ব্যবস্থা সুরেন্দ্রনাথই করে দিয়েছেন। মৃত্যুশয্যায় পড়বার আগে পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ কারো কোনো সেবা নেননি অথচ সংজ্ঞা যখন ক্রনিক ডিসেন্ট্রিতে কাতর তখন সুরেন্দ্রনাথ রোজ আপিস থেকে ফিরেই সংজ্ঞার জন্য রোজ একটি করে বটের পাখির মাংস মাখন-মরিচ দিয়ে ইকমিক কুকারে দীর্ঘদিন ধরে রেঁধে দিয়েছেন।

জ্ঞানদানন্দিনীর প্রশংসায় সংজ্ঞা পঞ্চমুখ ছিলেন। তাঁর ভালোবাসাও পেয়ে গেছেন সারা জীবন। যদিও সংজ্ঞা সুরেন্দ্রের যত্ন নেন না, খাওয়া দেখেন না, সাজগোজ করেন না—এ দুঃখও তাঁর খুব ছিল। জ্ঞানদা দেবীর সামাজিকতা ও কর্তব্যবুদ্ধির অনেক গল্প করেছিলেন, আজ সব মনে নেই। একটি চমৎকার গল্প বলি—সরলা দেবীর *জীবনের ঝরাপাতা* যাঁরা পড়েছেন তাঁর জানেন যে তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ একাধিক হয় কিন্তু বিয়ে আর হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত ঘটল রামভজ দত্তচৌধুরীর সঙ্গে। যথারীতি জ্ঞানদানন্দিনী বেশ ঘটা করে জামাই নেমন্তন্ন করলেন। কলকাতায় স্টোর রোডের বাড়িতে মস্ত ভোজ। টেবিলে পরিবারের প্রধানেরা সবাই বসেছেন। রামভজের দু'পাশে বসেছিলেন সরলা আর ইন্দিরা। জ্ঞানদা কৌতুক করে প্রশ্ন করলেন, 'রামভজ, দুই সুন্দরী মেয়ে দুই পাশে নিয়ে খেতে বসেছ, কে বেশি সুন্দর বলো তো ?' রামভজ দুইদিকে দুই হাত বাড়িয়ে সপ্রতিভভাবে তৎক্ষণাৎ ইন্দিরাকে দেখিয়ে বললেন, 'ইন্‌নে ঠাণ্ডী বিজ্‌লী', আর সরলাকে দেখিয়ে বললেন— 'উন্‌নে চমকতী বিজ্‌লী।' টেবিলের সবাই হেসে অস্থির, গুরুজনেরাও।

সন্ন্যাসিনী স্বরূপানন্দকে আমি ভুবনেশ্বর নিম্বার্ক আশ্রমে, কাশীতে শিবালায় গঙ্গামাঈ-এর মাতৃ-আশ্রমে, পুরুলিয়ায় বিজয়কৃষ্ণ আশ্রমে দেখেছি। ব্রাহ্ম বংশে জন্ম

হলেও তিনি হিন্দুমতে দীক্ষা নেন প্রথমে স্বামী সচ্চিদানন্দের কাছে। তখন তাঁর বয়স আন্দাজ ছত্রিশ, স্বামী বেঁচে, সংসার পরিপূর্ণ। শ্রীরাম ঠাকুর, মহর্ষি সত্যদেব, শ্রীসন্তদাস বাবাজী, কালীপদ গুহরায়—আরও বহু সাধুসঙ্গ করেছেন। দীক্ষা নেবার ২০ বছর বাদে আনন্দময়ী মায়ের কৃপায় হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভের দিনে সন্ন্যাস নেন। শ্রীবিজয়কৃষ্ণের শিষ্য কিরণচাঁদ দরবেশ। দরবেশজীর শিষ্য অসীমানন্দ নিজে বাড়িতে এসে স্বরূপানন্দকে আবার সাধন দেন। আশ্চর্যের কথা, সেই একই মন্ত্র ৭১/৭২ বছর বয়েসে এই শেষ দীক্ষা। এরপরে শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীতে দীর্ঘদিন বাস করেন আর পুরুলিয়া রামচন্দ্রপুর—তারপর ফের শান্তিনিকেতন। অমাবস্যার গভীর রাতে কালীপূজার সময় তাঁর দেহান্ত ঘটে।

বিভাব, শারদীয় ১৪০১

রান্নার বই প্রসঙ্গে

রন্ধনশাস্ত্রের সংস্কৃত নাম সূপশাস্ত্র। অথর্ব বেদের উপবেদ অর্থশাস্ত্র—এটা ছিল তারই অঙ্গ। এ-শাস্ত্রের কোনো যথার্থ প্রাচীন বই পাওয়া যায়নি। তবে ষোড়শ শতকের বৈদান্তিক পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী তাঁর *প্রস্থানভাষ্যে* সূপশাস্ত্রকে স্বীকার করেছেন। রান্না-ভাঁড়ারের কথা রামায়ণ থেকে শুরু করে সাহিত্যের নানাস্থানেই আছে, কিন্তু রন্ধনবিধি কোথাও নেই, অর্থশাস্ত্রেও নেই। এদিকে রাজা নল, ভীম ও দ্রৌপদীর নামে সংস্কৃত ভাষায় বই আছে বলে লোকপ্রবাদ। রন্ধনপটু পণ্ডিতেরা বই লিখে পৌরাণিক মুনিঋষি কিংবা রাজারানীর নামে চালিয়ে দিয়েছেন। যেমন সেকালে হতো।

নল-বিরচিত যে *পাক-দর্পণ*খানি আমি দেখেছি তার ভাষা সহজ ও আধুনিক, নির্ণয়সাগরের ছাপার হরফ। তারিখ বলা গেল না। দশ প্রকরণে বই শেষ—কোনো তরুণ গবেষক সামান্য পরিশ্রম ক'রে স্বচ্ছন্দ গদ্যানুবাদের সঙ্গে বইটি ছাপালে অনেকের কৌতূহল মিটবে। ভীমসেন বা দ্রৌপদীর কোনো পাকদর্পণ আমার দেখা নেই। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থের *প্রাচীন শিল্প-পরিচয়*-এর[১] শেষ পরিচ্ছেদে 'খাদ্যশিল্প' দ্রষ্টব্য। কৌতূহলীরা উক্ত খাদ্যশিল্প অধ্যায়টি অবশ্য পড়বেন। বেশ কিছু খাদ্যবস্তুর কথা *নৈষধচরিত*-এ দময়ন্তীর বিবাহ-দিবসের ভোজসভায় আছে। 'কুতূহল' নাম দিয়ে কিছু কিছু পাক-শাস্ত্রও সেকালে ছিল বলে শোনা যায়।

এখন বাংলা ভাষায় প্রথম রান্নার বই কী লেখা হয় তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কারের লেখা *পাকরাজেশ্বর*[২] দিয়ে আমরা শুরু করছি—কারণ প্রথম বই বলে এরই খ্যাতি। ভূমিকায় তর্কালঙ্কার লিখেছেন ক্ষেম শর্মার *ক্ষেম কুতূহল* এবং নিয়ামৎ খাঁ (শাজাহান বাদশার নিত্য ভোজের কিছু ব্যবস্থা যিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন) ও নবাব মহাবৎ জঙ্গের ফার্সি বই থেকে তিনি রান্নার বিধান নিয়েছেন, আর খাবার হজম করবার ব্যবস্থা *জীর্ণ-মঞ্জরী* মূলের সঙ্গে তিনি অনুবাদ করেছিলেন। ছোট একশো পাতার বই। নব্যন্যায়ের চর্চা ছেড়ে তর্কালঙ্কার যে রন্ধন-চর্চায় মন দিয়েছিলেন তা নিশ্চয় কোনো রাজা বা জমিদারের নির্দেশে এবং দাক্ষিণ্যে। দুঃখের বিষয় পণ্ডিতমশাই তাঁর ভূমিকায় পৃষ্ঠপোষকের নামটি উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। (শোনা আছে *পাকরাজেশ্বর* প্রকাশে বর্ধমান রাজার দান ছিল)। বহুদিন ধরেই এ-বই ছাপা ছিল না। সজনীকান্ত দাস তাঁর 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'য় এটি সম্ভবত ছাপান। সেটাও পাওয়া যায় না।

যদিচ তর্কালঙ্কার মশাই নিয়ামৎ খানের ফার্সির সঙ্গে সংস্কৃত *ক্ষেম কুতূহল*-কে মিশিয়ে লেখার চেষ্টা করেছেন তবু *পাকরাজেশ্বর* বইটি কিন্তু খুবই অগোছালোভাবে লেখা। তাছাড়াও প্রশ্ন থাকে তাঁর *ক্ষেম কুতূহল* কি পুঁথি না ছাপা বই ? তাঁর আদর্শ কোনো বাংলা বই ছিল কি ? তিনি নবাব মহাবৎ জঙ্গের পরিচয় দেননি—তাঁর রান্নাঘরের খাবারদাবারের কথা কে লিপিবদ্ধ করেছিলেন ? তাঁর নামও আমাদের দেননি।

বইয়ের প্রথমে রান্নাঘর—তার উনুন ন্যাতা ঝাঁটা শিলনোড়া হামামদিস্তে নিয়ে হাজির। তারপর রান্না ব্যাপারটার সাত ভাগের কথা—ভাজা পোড়া সেদ্ধ ইত্যাদি। বলতে না বলতে এক সুন্দরী পরিবেশিকা খোঁপায় ফুল জড়িয়ে উপস্থিত। তারপর মৎস্য-মাংস, ঘৃত প্রকরণ, তারপর রোটিকা, ফাঁকে ফাঁকে মাংস—আবার মোরব্বা, সেখানে হিদে জোলার নাতি'র মতো হঠাৎ থোড়ের মোরব্বা—তাতে গন্ধদ্রব্য আর কুঙ্কুম চূর্ণ দিয়ে এলাচ লবঙ্গ দারচিনি ঘি নেবু দই সব মিশিয়ে বস্তুটি কেমন হবে তা বলা নেই। তেরো-চোদ্দরকমের যে রোটির নাম পাচ্ছি তারা বাঙালির ঘরোয়া রান্না নয়। লুচিকে লোচিকা, কচুরিকে কর্চরিকা, পাপরকে পর্পট বললে শুনতে গম্ভীর হয়, কিন্তু সন্তানিকা খুর্জরিকা সেটা কখনো মাখা ময়দা খেজুরের গড়নে রসে ফেলা, কখনো বা সরভাজার নাম। আচারের নাম সন্ধানিকা। লেখক হাতা দিয়ে যতই 'উলুত-পুলুত' করুন না কেন—বইটি পড়ে বা দেখেশুনে কোনো কৌতূহলই মেটে না।

বইয়ের প্রথম ছ'পাতায় সংস্কৃত শ্লোক রয়েছে। এগুলি কি ক্ষেমশর্মার রচনা ? তারপর শেষ ছ'পাতায় আবার সংস্কৃত, অর্থাৎ *জীর্ণমঞ্জরী*। তার এক জায়গায় আছে—মৃগনাভি, কর্পূর, কুঙ্কুম, জায়ফল, জৈত্রী আর নারকোল প্রচুর খেয়ে যদি অজীর্ণ রোগ হয় তবে সমুদ্রফেনক কতটা যেন খেতে হবে, আর গণ্ডার গোসাপ সজারুর মাংসের উপকারিতা। এর দ্বারা পাঠকেরা কত নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন তাঁরাই জানেন। বইয়ের নাম তো খুব হয়েছিল। তর্কালঙ্কার মশায়ের যশোভাগ্য ভালোই ছিল দেখা যাচ্ছে। কোনো মাপজোখ দেননি কোথাও। ভালো ক'রে পড়লে বোঝা যায়—রান্না করেননি, আর কেউ এভাবে রাঁধতে চাইবে—সেদিকেও নজর দেননি। যা হয় ক'রে বাংলা ভাষায় কিছু লিখে গেছেন। তখন তো আয়ুর্বেদশাস্ত্র পাওয়া কঠিন ছিল না। সেখানে খাদ্যপাক আর পথ্যের কথাও ভালোভাবে দেওয়া আছে।

এবার আসা যাক *ব্যঞ্জন রত্নাকর*-এ। বর্ধমান মহারাজ মহতাবচন্দ্ বহু অর্থব্যয়ে এ বই লিখিয়ে বিতরণ করেন ১৮৫৮ সালে। বই শেষ হবার বছর সাত পরে মুন্সি মহম্মদী আর গোলাম রব্বানির সঙ্গে এলেন দুর্গানন্দ কবিরত্ন। দ্বিতীয় সংস্করণ লেখা না থাকলেও বই বেরনোর তারিখ ১৮৬৫ (বা ১৭৮৭ শক)। দশ প্রকরণে একশো চুয়াত্তর পাতায় বই শেষ। রোটী, আঁশ, কালিয়া, পলান্ন, শূল্য, হরীসা, ষষ্ঠরঙ্গ মাংস, তবকী সোমসা, অন্ন, দালি—এই ক'রকমের মোট পাক। নাম শুনবেন—বরদী, তিলী, তুন্‌কী, পনীরী, বাখরখানি, বাদামী, খাতাই, বেসমী, জোয়ারী, রুমী, সিন্ধোয়া, তবকী বা স্তবকী (ছাগতৈল আর পেস্তাচূর্ণ মেখে) দুগ্ধাক্ত শীরমাল, সুজি দুধ দই জায়ফল

লাহোরী-লবণ দিয়ে আরক্ত শীরমাল, তাফতাঁ, ছোয়ারা তন্দুরী, বাখরখানি আর আম্রমাংস পূরিকা। নানা অপরিচিত খাদ্যনামে বইটি ভরা। দুর্গানন্দ শুধু বাংলা ক্রিয়াপদ না যুগিয়ে একটি অর্থপুস্তক লিখে দিলে অনেক সহজ ও সরেশ ব্যাপার বা 'পাঠেন সিকি ভোজনম্' হতে পারত। মাংস মিষ্টান্ন সবেরই এলাহি ধরন-ধারণ। মধ্যে মধ্যে মশলায় সারিসারি অখণ্ড লবঙ্গ ও দারচিনি, পেস্তা ও দ্রাক্ষা (কিসমিস মনে হয়), কুঙ্কুম, কেশরী, জাফরান, আলতা, বাদামী, চন্দনী আর সবুজ-রঙা ঘি। চোখে দেখতে না পেলেও পড়েই আরাম।

অল্প বয়েসে পুরনো দিল্লিতে ঘন্টেওয়ালার দোকানে বসে বসে লড্ডু, সোহন হালুয়া আর নমকীন খেয়েচি, গল্প শুনেছি বিস্তর। ইদানীং সরকারী কল্যাণে ১৯৭৪ সালে *লখনউ গুযিশ্‌তার* বাংলা অনুবাদ পড়া গেছে[৪], কিন্তু তাতে শুধু নামের বাহার আর বাদশাহি মেজাজের কথা। বাদশার ছ'খানা পরোটা করতে রোজ তিরিশ সের ঘিয়ের খরচ। ডাল রাঁধুনী শুধু একটি ডাল রেঁধেই মাসে পাঁচশো না হাজার টাকা মাইনে নেয়, তাও আবার ঠিক সময়ে বাদশা খেতে না এলে রাঁধা ডাল গাছতলায় ফেলে দিয়ে কাজ ছেড়ে চলে যায়! খাবার তো নয়, সব যেন যাদুকরের ভেলকি। ও-বইতে কোনো রান্না নেই, কারণ লখনউ বা মেটেবুরুজের নবাব ছাড়া ঐ রান্না তো কারো হেঁসেলে হতে পারে না। সেদিক থেকে *ব্যঞ্জন রত্নাকর* জোরদার বই। এতে শুধু চমকই নেই, হিসেব মাপজোখও আছে। বর্ধমানরাজ বই বিক্রি করেননি (বিতরণ করেছিলেন), তাই তেমন প্রচার হয়নি।

১৮৬৫ সালের পরে আরো পনের-কুড়ি বছর, ধরা যাক ১৮৮০-৮৫ সাল, অর্থাৎ মধ্য-পর্বে অনুমান করি কিছু-কিছু রান্নার বই নিশ্চয়ই লেখা হয়েছিল। আমার না-জানার কারণ অনেক। বেঙ্গল গেজেট কখনো চোখে দেখিনি। পুরনো লাইব্রেরি ঘুরে ঘুরে বই দেখা আমার জীবনে কখনো সম্ভব হয়নি। লোকের মুখে শোনা কথা আর নিজের চোখে যৎসামান্য দেখা—এটুকুই আমার সম্বল।

রান্নার বই লেখার একটা প্রমাণ শরৎকুমারী চৌধুরানীর (লাহোরিনী, জন্ম ১৮৬১) লেখা থেকে— কোনো বড়মানুষের গিন্নি তাঁর অতিথিকে ঘরদোর দেখাতে দেখাতে বলছেন এখানটাই আমার পুঁটেপুঁটে মেয়ে বৌগুণো নিজেরাই কুটনো বাটনা রান্না সব করে। ওদের জন্যে 'রান্নার বই' কিনে দিয়েচি (*শুভবিবাহ, প্রকাশক* : মজুমদার লাইব্রেরি, ১৯০৬)[৫]। এখন এই রান্নার বইয়ের নাম কি ? কারই-বা লেখা ? ছোট ছোট মেয়েরা বর্ধমান রাজবাড়ি দূরের কথা, পাকপ্রণালী দেখলেও তাদের খুব সুবিধে হবে না।

চিৎপুরে যাঁরা গোয়েন্দা কাহিনী, ইন্দ্রজাল বিদ্যা আর পুরোহিত-দর্পণ বিক্রি করতেন তাঁদের *সহজ রন্ধনবিদ্যা* খুবই পুরনো বই। ভিতরে তারিখ না থাকলেও সার্টিফিকেট দেখে সময়ের অনুমান হয়। ছোট বয়সে বক্‌সার ও গয়া শহরে এবং আরায় আমি চিৎপুরের ছবিওয়ালা রান্নার বই দেখেছি। বিশেষ ক'রে বৈষ্ণবচরণ বসাকের বই[৬] খুব চলত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, তালতলা পাবলিক লাইব্রেরির পুরনো ক্যাটালগ দেখলে রান্নার বইয়ের কিছু নাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তেমন খুব পুরনো নয়। আমাদের তীর্থগুলিতে মন্দিরে মন্দিরে ভোগ রন্ধনপ্রণালী আলাদা, কিন্তু সে-সব কখনো ছাপা হয়েছে বলে জানিনে। জগন্নাথদেবের ছাপ্পান্ন ভোগের ফর্দ পাওয়া যায়, রান্নার ঘর ঘুরে ঘুরে দেখার (অবশ্যই দূর থেকে) অনুমতিও মেলে, কিন্তু রন্ধন-পদ্ধতি বাংলায় অন্তত নেই, ওড়িয়ার কথা জানিনে। কালীঘাট আর তারকেশ্বরে বিশেষ তিথিতে বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা আছে। কালীঘাটে টেম্পল কমিটির সেক্রেটারি ও তারকেশ্বরে মহন্তজীকে বহুবার জানিয়েও ফল পাইনি। বৃন্দাবনে শ্রীনিম্বার্ক আশ্রমে মহন্তজী খুব রন্ধন-শিল্পে নিপুণ। একমাত্র তিনিই তাঁদের পদ্ধতি দিতে সম্মত হয়েছিলেন। আমার দুর্ভাগ্য যে সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়ে পড়ায় এ-বস্তু আর পেলুম না।

আমিষ আর নিরামিষ সমস্ত রকম খাবার চিনতে চাখতে আর লিখতে যাঁর কোনো জুড়ি ছিল না—তিনি *'যমদত্ত' —প্রথমে হাটখোলার ইদানীং পাকপাড়ার যতীন্দ্রমোহন দত্ত*। তাঁর কাছে কিছু শিখে এবং জেনে নেবার সুযোগ আমি কখনো পাইনি।

সবচেয়ে পুরনো পাক-প্রণালী আমরা যা দেখছি তা অতি ছোট সাইজের—যেন পকেট সংস্করণ। তারিখ নেই। একটি বইয়েরই দু'টি ভাগ—*পাক-প্রণালী* ১১০ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় ভাগ *মিষ্টান্ন পাক* ১১৪ পৃষ্ঠা।[৭] পরিশিষ্টে বাংলা পয়ারে *পাকরাজেশ্বর*-এর অনুবাদ। সে-অনুবাদের একটু নমুনা দিই :

স্নান করি সুন্দরী শোভন বস্ত্র পরি।
সুচারু নূতন ধূপ গন্ধে অঙ্গ ভরি॥
কর্পূর সৌরভ মুখে অনঙ্গ বিভোল।
বলে ছলে মৃগ মদে নয়ন হিল্লোল॥
ওষ্ঠ দুটি পরিপাটী বিম্ব ফল জিনি।
সুকোমল মুখে মৃদু মধুর হাসিনী॥
সুগন্ধ পুষ্পের গুচ্ছে কবরী বন্ধন।
নৃপ পরিবেশিকার এমত লক্ষণ॥

পরবর্তী সংস্করণে এই পদ্যানুবাদ অংশকে সম্ভবত অনাবশ্যক মনে ক'রে বিপ্রদাস মুখুজ্জে বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু পুরনো বইয়ের অনুবাদ হিসেবে এটি সম্পূর্ণ আকারে এখন ছাপানো উচিত বলে আমরা মনে করি। সাল-তারিখের ব্যাপারে বিপ্রদাসের ঔদাসীন্য মারাত্মক রকমের। ক্বচিৎ কোথাও তারিখ আছে। সংস্কৃত কলেজে পড়ার পর নানা ধরনের বই লেখার সঙ্গে সঙ্গে রান্নার গবেষণাও তাঁর চলত। কেন যে রন্ধনশাস্ত্র তাঁর এমন মনোহরণ করেছিল তা নিজে কিছুই বলেননি।

গুরুদাস চাটুজ্যের মেডিক্যাল লাইব্রেরি থেকে বিপ্রদাস মুখুজ্জের পাঁচ খণ্ডে প্রায়

পাঁচশো পাতার *পাক্-প্রণালী* বেরলো।[৮] শেষ খণ্ডের তারিখ ১৮৯৩ বা ১৩০০ সাল। একেকটি খণ্ডের শুরুতে হেডপিসে কাঠের ব্লকে রাঁধুনির ছবি থাকত। পুরনো সংস্করণের 'ফর্দমালা' এবং পরিশিষ্ট নতুন সংস্করণে বাদ দিতেন। বর্জিত পরিশিষ্ট থেকে দুটো-একটা কথা বলি।

এক জায়গায় দিচ্ছেন কলকাতার বাজারের প্রচলিত মিষ্টান্নের নাম। যথা—সন্দেশ উনপঞ্চাশ রকমের, ক্ষীরের মিষ্টি আঠারো রকমের, শুধু গুড় বা চিনির এগারো রকমের। ঘিয়ের খাবার বা জলখাবার পঁচিশ রকমের। লেডি ক্যানিং পান্তুয়ার মধ্যে লেডিকেনি বা লেডিগেনি হয়ে এখনো বেঁচে আছেন। বিপ্রদাসের বইয়ে কলকাতার সন্দেশ প্রকরণে পাচ্ছি—লর্ড রিপন, গুড্ মর্নিং, চালতাফুল আর জোড়া পরী। এসব সন্দেশ চোখে দেখা দূরের কথা, নামও শুনিনি। নিরামিষ খাবারের ফর্দে দিয়েছেন একুশ রকম লুচি, চৌত্রিশ রকম রুটি আর একত্রিশ রকম পরোটা। শুধু এই ফর্দ থেকেই কলকাতার মানুষের ময়দার হুজ্জৎ বা জলখাবার-পর্ব বোঝা যায়। এরও চেয়ে চমৎকার হল 'স্ত্রীলোকদিগের শরা সাজাইবার ব্যবস্থা'। সেখানে লেখক বলছেন— 'ভোজের দিনে স্ত্রীলোকেরা মাছ ও মিষ্টান্ন পুরুষদিগের তুলনায় অনেক বেশি খাইয়া থাকেন এবং প্রচুর খাইবার পরেও তাঁহারা নিজেরা, তাঁহাদের সন্তানগণ ও দাসীরা হাতে করিয়া মিষ্টান্নের শরা লইয়া যাইতে বিশেষ পছন্দ করেন। স্ত্রীলোকদিগের শরায় অন্ততঃ আটপ্রকার বৃহৎ গড়নের মিষ্টান্নাদি দিতে হয়। যেমন—অমৃতি, বালুশাহী, খাজা, উত্তম মতীচুর বা মণ্ডা, পান্তুয়া, সন্দেশ, কচুরী ও সিঙ্গাড়া।'

শরৎকুমারী চৌধুরানীও লিখেছেন—কলকাতায় বড়ঘরের বৌয়েরা বেনারসী ও হীরের গয়না পরে ক্ষীরের ভাঁড় হাতে ক'রে পালকিতে উঠতেন। ক্ষীরের ভাঁড়ের প্রতি লোভ স্বাভাবিক, কারণ ভালো সোনালি রঙের ক্ষীরের পাক সর্বত্র সমান হয় না। খাদ্যরসিক সুকুমার সেনের পিতামহী রোজ ভারি পেতলের কড়ায় ক'রে নিজে নারায়ণের বৈকালীর সোনালি ক্ষীর তয়ের করতেন আর হরি ঠাকুর কাউকে না দিয়ে সেটি বাড়ি নিয়ে যেতেন।

এতরকম রান্না নিখুঁতভাবে শিখতে বিপ্রদাসের নিশ্চয়ই বিস্তর সময় লেগেছিল। তাছাড়া একাধিক হালুইকর আর বাবুর্চির সাকরেদিও অবশ্য করেছিলেন। তাদের কোনো নাম করেননি। হঠাৎ যেন সব আকাশ থেকে পড়েছিল। দু'য়েক ছত্র ব্যক্তিগত কথা ভূমিকায় থাকলে কত চমৎকার আর জ্যান্ত হতো এ বই!

আরো তিনটি ছোট রান্নার বই বিপ্রদাস লিখেছিলেন—*শৌখিন খাদ্য পাক*, *রন্ধন-শিক্ষা* আর *পথ্য-রন্ধন*।[৯] এছাড়া *শুভবিবাহ তত্ত্ব*, *গৃহস্থালী*, *বেদম হাসি*, *খোকার মার গান*, *মেয়েলি ব্রতের ছড়া*, *অপঘাত মৃত্যু নিবারণ*, *কলম বাঁধা প্রণালী*, *সবজী শিক্ষা*, *দেদার মজা*, সাত-আটখানা স্কুলপাঠ্য বই, রেনল্ডসের *প্রাচীন লণ্ডন রহস্য*। নেপোলিয়ানের জীবনীও তাঁর লেখার ইচ্ছে ছিল, হয়ে ওঠেনি। প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়াতেই বিপ্রদাসের মৃত্যু হয়। পুত্র অভিনেতা নাট্যজগতের অপরেশচন্দ্র বাপের

একটি জীবনী লেখালেও পারতেন। বিপ্রদাসের বই বহুদিন আর পাওয়া যেত না। আনন্দ পাবলিশার্স *পাক প্রণালী* আর *মিষ্টান্ন পাক* দু'টি ছেপে একটা অভাব মোচন করেছেন।

ঠাকুরবাড়ির মেয়ে-বৌয়েরা সকলেই অল্পবিস্তর রন্ধনপটু ছিলেন। তবু রন্ধনশাস্ত্রে দেশিকোত্তমা উপাধিটি শুধু প্রজ্ঞাসুন্দরীর প্রাপ্য। প্রজ্ঞা দেবী লিখেছেন মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের কাছে রন্ধন ছিল কলাবিদ্যা। নিজের রান্নার শখ ছিল, মেয়েদের অতি যত্নে এবং অর্থব্যয়ে নৈপুণ্য অর্জনে সাহায্য করেছিলেন। হেমেন্দ্রের ইচ্ছা ছিল রান্নার একটি বই লেখার। হয়ে ওঠেনি। কিন্তু নানা তথ্যে পূর্ণ একখানি মূল্যবান খাতা রেখে যান, যা থেকে আচার চাটনি হালুয়া মোরব্বা ইত্যাদির উপদেশ প্রজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন।

আসামের লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়ার সঙ্গে প্রজ্ঞাসুন্দরীর বিয়ে হয় ১৮৯১ সালে। তখনই রন্ধনকুশলতার জন্যে প্রজ্ঞার খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। বিয়ের পর স্বামীর সাহায্যে এবং উৎসাহে রন্ধনশাস্ত্র-চর্চা শুধু নয়, রীতিমতো গবেষণায় মন দেন। অসামান্য পরিশ্রম ক'রে লিখে ফেলেন—*আমিষ ও নিরামিষ আহার* প্রথম খণ্ড। কাছাকাছি চারশো পাতার বই, আখ্যাপত্রে তারিখ নেই। মৌখিক তথ্য থেকে বলছি ১৩০৪-৫ সালে প্রথম কন্যা সুরভির মৃত্যুর কারণেই হয়ত দ্বিতীয় খণ্ড বেরোয় দেরিতে, ১৩০৯ সালে। এই দু'খণ্ডে শুধু নিরামিষ রান্না। তারপর পাঁচ বছরের পরিশ্রমে আমিষ খণ্ড বেরোয় আটশো পাতার, ১৩১৪ সালে। তাঁরা তখন হাওড়ায় রোজমেরি লেনে। প্রজ্ঞা ৩য় খণ্ডে বলেছেন, দিশী ধরনের আমিষ রান্না যা জানেন সব দিতে পারেননি। আরো একখণ্ড লিখবেন, —কিন্তু এই ৪র্থ খণ্ড আর বেরোয়নি।[১০] দেড় হাজার পাতার এই বই পুরো তৈরি করতে তাঁর যেমন অর্থব্যয় তেমনি ধৈর্যের পরীক্ষাও হয়েছিল।

প্রজ্ঞার একটি কথায় বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রকাশ দেখে আমরা আনন্দিত হয়েছি। সেটি এই— 'খাদ্যের দ্বারা যেমনটি আমরা মানব ইতিহাসের পেটের কথা জানিতে পারি এমন আর অন্য কিছুতে নহে।'

প্রজ্ঞা দেবীর তিনখানি বই তিনখণ্ডের রন্ধন কোষ। এর সূচিপত্র, পরিভাষা, সংসার-জীবনের জ্ঞাতব্য তথ্য সমাবেশ সবই নিখুঁত। কলকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারে খুব চল ছিল বইটির। কবি বিষ্ণু দে লক্ষ্মীনাথের গল্প প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, প্রজ্ঞাসুন্দরীর রন্ধনশিল্পের বাংলা বই আমাদের অনেকেরই খুব পরিচিত ছিল।

এ ছাড়াও আরো দুটি রান্নার বই তিনি লেখেন—*জারক*, তারিখ জানা নেই[১১] এবং *সংক্ষিপ্ত আমিষ ও নিরামিষ আহার* (১৩২১)।[১২] *জারক*-এর একটি রিভিউ বেরোয় *মানসী ও মর্মবাণী* পত্রিকায়। প্রজ্ঞা দেবীর বড় তিন খণ্ডেরও ভালো রিভিউ নিশ্চয়ই হয়েছিল, তবে তা ঠিক জানা নেই। *সংক্ষিপ্ত আমিষ নিরামিষে* অনেক নতুন রান্না আছে। এটিকে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ৪র্থ খণ্ডও বলা যেতে পারে। এতে রয়েছে 'রামমোহন দোলমা পোলাও'—খুব ভারি আর মশলাদার জিনিস। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশতম জন্মদিনে

কপি, খোয়াক্ষীর, বাদাম-কিসমিস, জাফরান-পাতা, আলতা আর সোনারুপোর তবক দিয়ে পরাত ভরে এমন বরফি করেছিলেন যে খেয়ে কেউ ফুলকপি বলে বুঝতে পারেননি।

একটা প্রশ্ন মনে থেকে যায়—এই 'কবিসম্বর্ধনা বরফি' খেয়ে কবি নিশ্চয় খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু গুণবতী ভাইঝিকে কেন দু'ছত্র অন্তত কবিতা লিখে দেননি,—যেমন নাতবৌ তনুজার হাতের সন্দেশ খেয়ে লিখেছিলেন— 'অন্তরে তব স্নিগ্ধ মাধুরী পুঞ্জিত/ বাহিরে প্রকাশ সুন্দর হাতে সন্দেশে।' ১৩, ২২ কবির কোনো লেখায় বা চিঠিতে এই সম্বর্ধনার উল্লেখ নেই। চিত্রা দেব এবং ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় যাঁরা প্রজ্ঞা দেবীর জীবনকথা আলোচনা করেছেন—তাঁরাও বলেননি। প্রজ্ঞা দেবীর কোনো উল্লেখ কবির লেখায় কখনো পাইনি। প্রজ্ঞা আরো নতুন রান্না উদ্ভাবন করেন। যেমন দ্বারকানাথ ফির্নি পোলাও আর সুরভি পায়েস (তাঁর ছোট্ট পাঁচ-বছরের মেয়ের স্মৃতিতে)। বই জুড়ে রান্নার অতিরিক্ত যা আছে তা হল সংসারের টুকিটাকি এবং সংরক্ষণ ব্যাপারটা, টোটকা চিকিৎসা ও ওষুধপত্র, পশু-পাখির যত্ন, বাসন-সার্সি সাফাই, কাপড় কাচা, বাজার দর আর রান্নার পরিভাষা। কবিরাজী আলুইয়ের বড়ি (নানা উপকরণ দিয়ে তৈরি ওষুধের বড়ি বা ট্যাবলেট) তৈরি প্রজ্ঞা জানতেন দেখে অবাক হলুম। *মাসিক বসুমতী*তে একাধিক ছোটগল্পে পড়েছি পাত্রপক্ষের অভিভাবকেরা বধূ নির্বাচন করতে এসে প্রশ্ন করছেন কন্যা আলুইয়ের বড়ি তৈরি করতে জানে কিনা!

বাংলা ভাষাচর্চায় যারা আনন্দ পান তাঁরা প্রজ্ঞাসুন্দরীর আর বরেন্দ্রের কিরণলেখা দেবীর *পাক-পরিভাষা* নিশ্চয় দেখবেন। দু'টো চারটে বলি—আগুন মারা, আঁখনির জল, এঁকে যাওয়া, একগিরা, কাঠখোলা, খামির, খাসা ময়দা, চিরকাটা, চমকানো, ছাঁচনা (শেষ কথাটির অর্থ বাট্‌নার শিল ধোওয়া জল যা রূপকথার গল্পে বেচারি ছোট রানী খেয়েছিল), তেল-ঘি পাকানো, ক্ষারণি জল—কলাগাছের গুঁড়ি কেটে টুকরো টুকরো ক'রে পুড়িয়ে ক্ষার বা ছাই ক'রে ছ্যাঁদা মেটে হাঁড়িতে রেখে একটু একটু জল দিয়ে কী কষ্ট ক'রে যে এটা তৈরি হয়! তা আবার ভীমকলা নইলে বীচেকলার ক্ষারই ভালো। পড়তে পড়তে থ' মেরে যেতে হয়!

একটু বাজারদর বলি, দু'টি কি চারটির : দশটি বড় বাছাই ইলিশ—পাঁচ টাকা, একশো পঁচিশটি বড় কই—ছ'টাকা, আধসের ভালো কাঠবাদাম ছ'আনা, আধসের সরেশ পেস্তা দশ আনা, একশোজনের ভাজা খাবার উপযুক্ত বড় বেগুন—দাম ন' পয়সা। মনে রাখা ভালো, তখন মেয়েরা থলি হাতে বাজারে যেতেন না, তাঁদের স্বামীরাও নয়— এই দর চাকরদের থেকে পাওয়া। মাছ-মাংসের যত্ন, কিভাবে কুটবে, বানাবে ধোবে, পচে গেলে কতটা বাদ যাবে ছাড়াও তাঁর একটি জিনিস সর্বত্র বিদ্যমান—সেটি নজর। যেমন, 'গঙ্গা হইতে সদ্য ধরা ইলিশ মাছটি দেখিবে নৌকার মত বাঁকা, যত বেলা বাড়িবে ক্রমে সোজা হইতে থাকিবে।'

১৯৩৭-৩৮ সালে লক্ষ্মীনাথ ছিলেন কাঠের ব্যবসা নিয়ে উড়িষ্যার সম্বলপুরে।

পারুল দেবীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ায় তাঁকে পারিবারিক বহু কথা প্রজ্ঞা বলেছিলেন। লক্ষ্মীনাথের সত্তর বৎসরের জন্মদিন পালিত হয়েছিল ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে। উৎসবের সমস্ত খাবার প্রজ্ঞার নিজের হাতে তৈরি। সত্তরটি দরবেশ একটি মস্ত পরাতে সাজিয়ে চারিধারে সত্তরটি মোমবাতি জ্বেলে দেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনেও এভাবে তিনি বাতি জ্বেলে দিয়েছিলেন বরফির থালা ঘিরে—একথা পারুলকে বলেন এবং নিজের হাতে কিছু লিখেও দেন। প্রথম মেয়ে সুরভির মৃত্যুর পর ইন্দিরা দেবী 'সুরভি তোমার ছিল না/তাই বুঝি ফুলের মতন/সৌরভ করিয়া বিতরণ/দুদিনে ত্যজিলে মর্ত্যধাম' —এই লেখাও পারুলকে লিখে দিয়েছিলেন দেখেছি।

প্রজ্ঞার কন্যারা—রত্না ও অরুণা দেবী—বই আর ছাপালেন না। বাংলা ভাষায় লেখা বই, তাই আসাম সরকারও যে উদ্যোগী হবেন, তা মনে হয না। প্রজ্ঞা দেবীর একটি সুন্দর ফোটো তৃতীয় খণ্ডে আছে। দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল—এত পরিশ্রম ক'রে বই লিখে কোনো সম্মান পাননি। অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় এমন রন্ধনকোষ এখন হযত আছে, তখন কোথাও ছিল না।

প্রজ্ঞাসুন্দরীর তৃতীয় খণ্ড বই বেরুবার কয়েক বছর পরে ১৯২১ বা ১৩২৮ সালে বের হল কিরণলেখা দেবীর *বরেন্দ্র রন্ধন*।[১৪] ১৩২৫ সালে লেখিকার অকালমৃত্যু না ঘটলে আমরাও আরো লেখা পেতুম। এতদিন কলকাতার রান্নার কথাই শুনেছি, এই প্রথম উত্তরবঙ্গকে পাওয়া গেল।

১৯২১ সালের পরে ১৯৮৮ সালে বেরিয়েছে রেণুকা দেবী চৌধুরানীর *রকমারি নিরামিষ রান্না*। দীঘাপতিয়া থেকে ময়মনসিংহ মুক্তাগাছায় আসতে সময় লেগে গেল সাতষট্টি বছর। কোচবিহার, ত্রিপুরা, রাঢ়দেশ, চট্টগ্রাম, ঢাকা কোথাও থেকে কোনো দিশী ভালো রান্নার বই বেরিয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

বরেন্দ্র রন্ধন রান্নার বিবরণ, পরিশিষ্ট, নির্ঘণ্ট ছকসুদ্ধ তিনশো পাতার ছোটই বই, কিন্তু এত গোছানো যে বলার কথা নয়। শুধু এই বইখানা নিয়ে বেশ কয়েক পাতা স্বচ্ছন্দে যা লেখা উচিত তার বদলে দিচ্ছি মাত্র কয়েক ছত্র।

কিরণলেখা বলেছেন বরেন্দ্রের নিরামিষ রান্নায় হলুদ পড়ে না। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছিলেন তাঁদের ঠাকুরবাড়িতে চৌষট্টি রকমের রান্নার কোনোটিতেই হলুদ বা লঙ্কা পড়ত না। বিপ্রদাস এবং প্রজ্ঞাসুন্দরীর বই এতই বড় যে দেখতে দেখতে খেই পাওয়া যায় না। এখানে সব রান্নার ফাঁকেই যেন রাঁধুনিকে দেখা যায়! এটা একটা মস্ত গুণ! ভাজা পোড়া সেদ্ধ আঁশ নিরামিষ পোলাও অম্বল চাটনি আচার কাসুন্দি সবই এতে আছে। তাঁর লেখা *জল খাবার*-এ[১৬] লুচি-কচুরি, আর *মেঠাই*-তে নানারকম মিষ্টির কথাও ছিল— শেষের বই দু'খানি এখন আর নেই। কিরণলেখা শিক্‌কাবারের কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন শ্রীরামচন্দ্র বনে গিয়ে শিক-পোড়া ক'রে মাংস খেতেন, অনেক প্রমাণও দিয়েছেন। ভট্টিকাব্যের সঙ্গে কাবাবের একত্র উচ্চারণের কথা ভাবা যায়! আরো বলেছেন, 'কলিকাতার ঘৃতবিশিষ্ট বৃহৎ কাঁকড়া বরেন্দ্রে মিলে না।' আহা! শুনেও আহ্লাদ।

কোথাও কতকগুলো ছড়ার, কোথাও *পাণিনিসূত্র* মায় *চৈতন্যচরিতামৃতের* উদ্ধৃতি দেখে আশ্চর্য হলুম, অথচ পণ্ডিতি ফলাননি—আলতোভাবে রান্নার প্রসঙ্গে উচ্চারণ করেছেন, বেমানান হয়নি।

খাসি আর ডাহুক পাখি লাউ দিয়ে খেতে ভালো বলতে গিয়ে বলছেন— 'এক ডাহুক সাত লাউ মজায়।' কচি পাঁঠার কালিযার কথায় বলেছেন—

উচ্ছে বীচি, পটোল কচি। শাকের ছা, মাছের মা।
কচি পাঁঠা বৃদ্ধ মেষ। দধির অগ্র ঘোলের শেষ। (প্রবাদ)

কোনো রান্না শিখেছেন রানাঘাটের পালচৌধুরী বাড়ি থেকে, কোনোটি এস্. ডি. ও.-পত্নী মিসেস মেকাট্রিকের কাছে—এইরকম বেশ কিছু উল্লেখ আছে। বরেন্দ্রের সবজী তো বটেই, মাছের নামও নতুন। কুচো মাছ হল নছি, মাঝারি নাম নহলা। ভিণ্ডালু বা ভিন্দালু নাকি কোর্মারই নাম, শব্দটা পোর্তুগীস। আনারস আর কাঁঠালের 'মুষলো' দিয়ে রান্না আছে। সবচেয়ে আমরা খুশি হয়েছি পাঁঠার মেটের অম্বলের কথা পড়ে—এটি তো বিদ্যাসাগর মশাইয়ের রান্না, কিরণলেখা পেলেন কি ক'রে! ১৩২০ সালে দইবড়া কলকাতায় বোধহয় আসেনি দুয়েকটি ঘর ছাড়া। লেখিকা বাল্যকালে কাশীতে ছিলেন, দইবড়া তৈরিতে লিখছেন— 'বারাণসীতে ইহা ধনীগৃহে গৃহস্থ গৃহে তৈয়ার হয় এবং সন্ধ্যায় রাস্তায়-ঘাটে ও রাস্তায় ফেরি করিয়া বিক্রয় হয়।' সবচেয়ে সুন্দর এ-বইয়ের কাসুন্দি অংশ। আট পাতা জুড়ে সব মশলা ও সব নিয়ম দিয়েছেন—বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়া থেকে শুরু। এটি একটি সুন্দর অনুষ্ঠান। কাসুন্দি যাতে বেশিদিন থাকে তার জন্য মেয়েরা নিজেদের ভাষা ও ছন্দে কতকগুলি গান করেন—সেগুলি (এখন বোধহয় হারিয়েই গেছে) কেন যে দিলেন না! কাসুন্দির মশলাকে ওদেশে বলে 'বারো সজের গুঁড়ো' —আম, ঝাল, ফুল, তেঁতুল, মান আর কুল কাসুন্দি দিয়েছেন—ঢেঁকিকে সিঁদুর হলুদের ফোঁটা দিয়ে বরণ করা হচ্ছে—ঘন ঘন জোকার (উলুধ্বনি) পড়ছে—বইয়ের শেষ এখানেই।

এ বইয়ে পরিভাষা নতুন রকমের। ডাগুর, দস্তাল, চুনাব, নতী, পাণিদলা, কলাপতু, আংসানো, নসনসে, লপেট গোছ, কড়ুই (কাঁটাওয়ালা বেগুন)—এসব পড়তে পড়তে বোঝা যায় একটু একটু। বন-কাঁঠাল ফলটা খেতে বাজে, তাই বোধহয় শিবঠাকুর এটি খান। এর সংস্কৃত নাম 'লকুচ' আর শিবের নাম 'লকুচপাণি'। বন-কাঁঠালের রান্নাও দিয়েছেন।

এরপর তখনকার দিনের একটি খুব চালু বই হল বনলতা দেবীর *লক্ষ্মীশ্রী*।[১৭] আমাদের কাছে ১৯২৪ সালের যে বইখানি রয়েছে তার আগেই ক'টা সংস্করণ বইয়ের হয়ে গিয়েছে। এতেও আমিষ নিরামিষ শাক শুক্তো মণ্ডা মিঠাই ছাড়া গেরস্থালি টুকিটাকি ওষুধ-বিষুধ, সবজীর চারা বসানো সবই ছিল। রান্নাঘর পরিষ্কার রাখার কথায় লেখিকা

বলেছেন, 'গৃহিণী রঙীন শাড়ী পরিয়া চুল সামলাইয়া মাথায় রুমাল বাঁধিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিবেন।' এইটে পড়ে ছেলেবেলায় খুব হাসি পেত। রান্না সব একই, নতুন নামের মধ্যে চিংড়িমাছের মায়ারানী আর উমারানী। এরা বোধহয় লেখিকার মেয়ে। মিষ্টান্ন প্রকরণটিও ভালো। দামী মশলা না দিয়ে সাধারণের জন্যে যত সহজে আর সংক্ষেপে মুখরোচক মিষ্টি করা যায় তাই আছে।

রান্নার বইয়ের শেষ নেই। না বললে নয় এমন কয়েকটা শুধু পুরনো বইয়ের নাম ক'রে যাই। নেপাল রাজ্যের চিফ মেডিকেল অফিসার, আশি বছর বয়স পর্যন্ত যিনি ডাক্তারি করেছেন, সেই সরলরঞ্জন দাশগুপ্তের বই *খাদ্য—সুস্থ ও অসুস্থ শরীরে।*[১৮] লেখার খুব ছিরিছাঁদ নেই। কিন্তু সব রান্নাই সহজসাধ্য আর রোগ ওষুধ ডাক্তারি সব জড়িয়ে আশ্চর্য একখানা বই। লেখার সময় ডাক্তারবাবুর বয়স ছিয়াশি। শরীর সুস্থ রাখার ব্যবস্থা যত্ন ক'রে লেখা। 'তেলীরবাগ ভবন' থেকে দাশগুপ্ত ব্রাদার্স বই প্রকাশ করেন।

এম. সি. সরকার প্রকাশিত সুলেখা সরকারের *রান্নার বই*[১৯] তাঁর জীবিত-কালেই কদর পেয়েছিল, এখনো সংস্করণ হয়। ওঁদের প্রকাশনার একখানি খুব ভালো বই স্নেহলতা দেবীর *আচার ও মোরব্বা।*[২০] এতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি ভালো ভূমিকা আছে।

ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব রান্না নিয়ে লিখেছেন পূর্ণিমা ঠাকুর, আনন্দ পাবলিশার্স ছাপিয়েছেন।[২১] কিছু কৌতূহল মেটায়। তনুজা দেবীর ছোট বই *পাঁচমিশালির*[২২] কদর হয়েছিল— বইটি বেশ ভালো। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর ভূমিকা আছে, তৎসহ দাদাশ্বশুর কবি সন্দেশ খেয়ে যে কবিতা লিখে দেন সেটি উপরি পাওনা।[২৩] ছাপানোর তারিখ ১৩৫৬ বা ১৯৪৯, এ-বই বাজারে পাওয়া যায় না।

বিভূতিভূষণের *আদর্শ হিন্দু হোটেল* প্রায় সবাই পড়েছেন, আর মনে রেখেছেন হাজারী ঠাকুরকে। সেই যিনি রান্না চোখে দেখেই বলে দিতেন, 'মাংস জঠুর হয়ে গেছে' —হাজারী ঠাকুর তাঁর নেপালি ধরনের মাংস রান্না আর চচ্চড়ির কথা যদি লিখে যেতেন! এখনো এ-ধরনের অনেক ওস্তাদ রাঁধুনির শুধু খাতাই আছে, বই ছাপানো নেই। যাঁদের সামর্থ্য আছে তাঁরা উদ্‌যোগ করলেন না দেখে মনে শুধু দুঃখ পাই।

সব শেষের বইটি *রকমারি নিরামিষ রান্না*—লেখিকা রেণুকা দেবী চৌধুরানী। ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার জমিদারবাড়ির বৌ। এগারো-বারো বছর বয়েস থেকে যত রান্না শিখেছেন সবই খাতায় লিখে রাখতেন। দাদাশ্বশুর মামাশ্বশুর বাড়ির আর পাঁচজন ছাড়া স্বামীরও উৎসাহ ছিল। নানাস্থানের বাবুর্চি আর রাঁধুনি তাঁরা আনিয়ে দিতেন— কোথায় শ্রীনগর আর কোথায় মালদার তারা গ্রাম থেকে ব্রতপালনের নিষ্ঠায় সারা জীবন শিখেছেন, রেঁধেছেন, খাইয়েছেন আবার তার ইতিহাসও লিখে গেছেন এমন কখনো শুনিনি।

বইয়ের ভূমিকায় লেখিকার দশ-এগারো পাতা 'আমার কথা' পড়ে চমৎকৃত হলুম।

এটি সাহিত্যে স্থান পাবার উপযুক্ত রচনা। বুদ্রঠাকুর নিজেকে জওহরলালের 'লেগে' দিয়ে জীবন উৎসর্গ করবার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে এমন দৃশ্য বাংলা স্টেজে কত যে মানাত!

যাদের কাছে রান্না শিখেছেন লেখিকা তাঁদের মনে রেখেছেন দেখে বড় ভালো লাগল। নুরু বাবুর্চির অভয়দানের কাহিনী পড়েও মনটা যেন ঐ সম্প্রীতির যুগের জন্যে কাতর হয়। বড় আয়োজনে সে অভয় দিয়ে বলত, 'ভয় করবেন না মা, গুরুকে স্মরণ করবেন। যদি কোনো সময় কিছু ভুলে যান, আমার নাম স্মরণ করবেন।' চাং পাঁঠার কথা, তক্তাবন্দী হাঁসের কথা,নীলগাই শিকার ও রান্নার দৃশ্যগুলি অবিস্মরণীয়। এভাবে রান্না শেখা বা রান্না করা এখনকার দিনে সম্ভব নয় সবাই জানেন। তবু দীর্ঘদিন বেঁচে আছি বলে এমন বই পড়তে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। রন্ধন যে 'উত্তমা-কলাবিদ্যা', তার ঐতিহ্য যে বাঙালি জাতেরই অনন্য গৌরব, তা আবার খাতার পাতায় নতুন করে প্রমাণ হল। সত্তর বছর আগে কিরণলেখা দেবীও ঠিক এই কথা বলে গেছেন—সুরাঁধুনিকে ধৈর্যশীল হতে হবে। রেণুকা দেবীর আমিষ ও আচার-খণ্ড বের হলে দেশ উপকৃত হবে বলে মনে করি। লেখিকা এ-বইয়ের মধ্যে বেঁচে থাকবেন।

এক্ষণ, শারদীয় ১৩৯৯

প্রমাণপঞ্জী

শিবমোহিনী ও বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ

১. দ্র. *আত্মকথা*। গুরুচরণ মহলানবিশ। কলকাতা, নির্মলকুমারী মহলানবিশ, আম্রপালি, ২০৪ বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা ৭০০ ০৩৫। আগষ্ট ১৯৭৪। দাম : ১৪ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৭৭।

এই বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় ৭ম ব্রাহ্ম/বিধবা বিবাহ এবং নববিধান সমাজের নেতা চণ্ডীচরণ সিংহের উল্লেখ পাই। দ্র. পৃ ৫৯, ৭২, ১০২-০৪, ১০৬, ১৩৪-৩৬।

আত্মকথা বইয়ের ৭২ পৃষ্ঠায় গুরুচরণ বলছেন :

৭ম ব্রাহ্ম বিবাহ বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের হয়। তিনি বিবাহ করিয়া আসিয়া আমার আরপুলি লেনস্থ বাড়ীতে সপরিবারে একত্রে বাস করেন। . . .

অন্যত্র উল্লেখিত হয়েছে :

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রথমেই আমাদিগের বিবাহ হইয়াছিল। আমাদিগের পরে যাঁহারা বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের আমাদিগের ন্যায় এত নিন্দা অপবাদ সহ্য করিতে হয় নাই। আমার বিবাহের ৫/৬ মাস পরেই শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ দাস অসবর্ণ বিধবা বিবাহ করেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সিংহ বিধবা বিবাহ করেন। . . .

২. *বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজ নামচা*—দ্বিতীয় ভাগ। শ্রী সুন্দরী মোহন দাস প্রণীত। [দশটি চিত্র সমন্বিত]। প্রকাশক : শ্রীপ্রেমানন্দ যোগানন্দ দাস, ৫৭/১/১এ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। [১৩৪২]। মূল্য : বারো আনা মাত্র। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৭৯। রাজশেখর বসু লিখিত 'বিজ্ঞাপন' সহ।

বৈধব্য-কাহিনী ১

১. দ্র. অমৃত-*মদিরা*। ম্যানেজার—ষ্টার থিয়েটার, বিবাহ-বিভ্রাট, তরুবালা প্রভৃতির লেখক শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত। "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।" "পূরিবে কীটের পেট, /কিছু বা পাঠাবে ভেট,/ পড়িলে পড়িতে পারে কোন সুলোচনা।"

কার্ত্তিক। জগদ্ধাত্রীপূজোৎসব। ১৩১০। পৃষ্ঠা সংখ্যা : [৪] + ২৯০।

আখ্যাপত্রের পিছনে লেখা আছে :

প্রকাশক— শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। বেঙ্গল মেডিক্যাল্ লাইব্রেরী, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। কলিকাতা—১৭নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, 'কালিকাযন্ত্রে' শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য : দেড় টাকা।

মোট ৬৩টি কবিতার সমষ্টি। প্রবন্ধে আলোচিত কবিতার নাম 'বালবিধবা' (পৃ. ১০৯-১৭)।

২. 'কলিকাতায় কয়েকদিনের জন্যও আসিলে কবিকে নানা কাজের মধ্যে এখনো জড়াইয়া পড়িতে হয়। আশী বৎসর বয়সেও লোকে তাঁহাকে রেহাই দেয় না। আচার্য জগদীশচন্দ্রের পত্নী অবলা বসু প্রতিষ্ঠিত নারীশিক্ষা সমিতি একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান, তাহার অন্তর্গত বিধবাদের শিক্ষাকেন্দ্র বাণীভবনে ২ জুলাই [১৯৪০] কবিকে লইয়া যাওয়া হয়। এখানে কবি বিধবা ছাত্রীদের সম্বোধনে বলেন যে 'আত্মমর্যাদা অনুভব ও অন্ধসংস্কার ত্যাগ ব্যতীত আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া যাইবে না।'

[দ্র. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, চতুর্থ খণ্ড, শ্রাবণ ১৩৬৩, পৃ ২১৭ ('প্রত্যাবর্তনের পর' নামক অধ্যায়)]।

মাতৃভক্তি

১. দ্র. *ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর*। শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। কলকাতা। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। প্রথম সংস্করণ : ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৮৮১ শকাব্দ, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৮৮৪ শকাব্দ। উৎসর্গ : আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৫০ + ৩১। দাম : ৫.৫০ নঃ পঃ।

সংজ্ঞা দেবী/সাধুমা স্বরূপানন্দ সরস্বতী

১. দ্র. কল্যাণী দত্ত : 'জোড়াসাঁকোর যৎকিঞ্চিৎ', *মহিলা-মহল*, শারদীয় ১৩৬৬।
২. দ্র. সংজ্ঞা দেবী : 'সেবিকার কৈফিয়ৎ', *মহিলা-মহল*,
৩. দ্র. সংজ্ঞা দেবী : 'সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর', *প্রবাসী*, মাঘ ১৩৬৬।
৪. দ্র. গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষ চৌধুরি (সম্পাদিত): *সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর : শতবার্ষিক সংকলন*। কলিকাতা। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশতবার্ষিকী সমিতি। ১২ শ্রাবণ ১৩৭৯/২৮ জুলাই ১৯৭২। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৪৮।
৫. দ্র. সংজ্ঞা দেবী : 'ওঁকে যেমন দেখেছি' [সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী সংজ্ঞা

দেবী (স্বরূপানন্দ সরস্বতী) -কথিত। শান্তিনিকেতন ৯.৭.৭২। মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়-কর্তৃক অনুলিখিত।] *সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর : শতবার্ষিক সংকলন* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।

৬. দ্র. *আমার খাতা*। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী। প্রকাশক— শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ৫৫, আপার চিৎপুর রোড্, কলিকাতা। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস্, ৫৫, আপার চিৎপুর রোড্,— কলিকাতা। শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত। ১৩১৯। উৎসর্গ: পরমারাধ্যতম স্বর্গীয় শ্রীনাথ ঠাকুর— পিতা ঠাকুর ও স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর শ্রীচরণে ভক্তি ও প্রণতির সহিত আমার এই খাতা উৎসর্গীকৃত হইল। মূল্য : বারো আনা। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৬৭ + [৩]।

৭. দ্র. সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রাগ ও মেলডি', *সবুজ-পত্র*, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩২৩ [*সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর : শতবার্ষিক সংকলন* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত]।

৮. দ্র. সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'বাংলার বেখাপ বর্ণমালা', *সবুজ-পত্র*, অগ্রহায়ণ ১৩২৪ [*সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর : শতবার্ষিক সংকলন* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত]।

৯. *একটি বসন্ত-প্রাতের প্রস্ফুটিত সকুরা-পুষ্প*। সত্য-মূলক জাপানী গল্প। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৩১৫। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১২২।

১০. দ্র. *মহাভারত* (মূল উপাখ্যান)। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্কলিত। ১৩১৩ সাল। মূল্য : ৪৲ টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : [৮], ৩০৬ ; দ্বিতীয় খণ্ড : [২], ২৮৯, সূচীপত্র। আখ্যাপত্রের পেছনে লেখা আছে : কলিকাতা। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে। শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত। ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

১১. দ্র. *বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ*। এ-কেলে কথকতা। সুরেন ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২১০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। বৈশাখ ১৩৪৭। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৮৬। মূল্য : দেড় টাকা।

রান্নার বই প্রসঙ্গে

১. *প্রাচীন-শিল্প পরিচয়*। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ। [আমাদের দেখা কপিতে আখ্যাপত্র ছিন্ন]। ১৩২৯ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা সংখ্যা : [২১]+২১২।
গ্রন্থকারের নিবেদন অংশে আছে :

> প্রাচীন-শিল্পপরিচয়ের অধিক সংখ্যক প্রবন্ধই ১৩১৯ সালের প্রথম হইতে সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কতক প্রবন্ধ অর্চ্চনা পত্রিকায় এবং নৌকাপ্রবন্ধটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্রিকার সম্পাদক মহোদয়গণ তাঁহাদের পত্রিকায় প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত করিয়া যে সহায়তা করিয়াছেন, তন্নিবন্ধন আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগৃহীত পুস্তকরাশি হইতে এবং প্রস্তরমূর্ত্তি হইতে প্রাচীন-শিল্পপরিচয়ের অধিকাংশ উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে ; অতএব সমিতির নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

আমার মত দরিদ্র লেখকের পক্ষে নিজব্যয়ে পুস্তক মুদ্রণ সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (মসুয়া, ময়মনসিংহ) অনারেবল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (গৌরীপুর) শ্রীযুক্ত কুমার হেমেন্দ্র কুমার রায় (দিঘাপতিয়া) শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন মৈত্র (রাজসাহী) শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী (উকিল, কলিকাতা হাইকোর্ট) এবং শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল্ (সেরপুর, ময়মন্‌সিংহ) সাহিত্যানুরাগ বশতঃ অর্থসাহায্য করাতেই, এই পুস্তকের মুদ্রণ-ব্যাপার সম্পন্ন হইল। তাঁহাদের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করিতেছি, এবং ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা দীর্ঘজীবী এবং চিরসুখী হইয়া স্বদেশের গৌরব বর্দ্ধন করুন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই মহোদয় এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত সমস্তই পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং ভূমিকা লিখিয়া দিয়া নিরতিশয় সাহায্য করিয়াছেন। এই পুস্তক লিখিবার জন্য তিনিই আমাকে প্রথম উৎসাহান্বিত করিয়াছিলেন, তন্নিবন্ধন আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ আছি। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট্ মহোদয়ের নিরতিশয় সাহিত্যানুরাগিতা এই পুস্তক মুদ্রণের অন্যতম কারণ বলিয়া উল্লেখযোগ্য। এই পুস্তক মুদ্রণের জন্য তিনি আমাকে বিশেষ উৎসাহদান করিয়াছেন। ভগবৎসমীপে সর্ব্বান্তঃকরণে আমি তাঁহার মঙ্গল কামনা করি।

বিশেষ বক্তব্য এই যে, প্রাচীন শিল্পপরিচয়ের প্রমাণ স্বরূপ বচন প্রভৃতি মুদ্রিত অমুদ্রিত যে সকল পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেইগুলি অনেক স্থলেই নিরতিশয় অশুদ্ধি-পরিপূর্ণ। সুতরাং অনেক স্থলেই অসঙ্গত পাঠ পরিত্যাগ করিয়া, যথাকথঞ্চিৎ সঙ্গত পাঠ যোজনা করিতে হইয়াছে। ইহাতে ভ্রম প্রমাদ হওয়া একান্তই সম্ভব। অতএব সবিনয় প্রার্থনা এই যে,—সহৃদয় পাঠকমহোদয়গণ অনুকম্পাপরবশ হইয়া আমার ভ্রম দেখাইয়া দিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

পুনর্মুদ্রণ : *প্রাচীন শিল্প-পরিচয়*। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিত ভূমিকা সংবলিত। কলিকাতা, সুবর্ণরেখা, ১৩৭৯। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৮, ১৭৩। [সচিত্র]।

২. *পাকরাজেশ্বর*। অর্থাৎ নানাবিধ পাকব্যবস্থা ও সংস্কৃত জীর্ণমঞ্জরী তদর্থসহ গৌড়ীয় ভাষায় সঙ্কলিত। বর্দ্ধমানাধীশ্বর হিজ্ হাইনেস্ শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাবচন্দ্ বাহাদুরের আদেশানুসারে। দ্বিতীয়বার মুদ্রিত। শকাব্দঃ ১৮০১ বাং ১২৮৬। কলিকাতা মৃজাপুর কল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭৮। ভূমিকা'য় আছে :

শ্রীশ্রীদুর্গা
সহায়া

ভূমিকা।

সর্ব্বশক্তিমান শ্রীশ্রীপরমেশ্বর সৃষ্টির কারণ অসাধারণ মহামোহময়ী মায়া বিস্তারিয়া ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম পঞ্চভূতাত্মকরূপে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডময় হইয়া জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জাদি চতুর্ব্বিধ শরীর ধারণ পূর্ব্বক স্বয়ং অধারাধেয় হইয়া সত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ ত্রিধাতুরূপে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় দ্বারা নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই দেহ ধারণের মূলাধার আহার, অতএব সর্ব্বোপভোগযোগ্য মানবদিগের নিমিত্ত অন্নপূর্ণা রূপ ধারণ পূর্ব্বক অম্ল তিক্ত মধুর লবণ কটু কষায় ষড়্রসযুক্ত চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য সকল সাত্বিক রাজসিক তামসিক ত্রিবিধ বিভাগ করিয়া অন্নদাসূপ নামক শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন ; ঐ শাস্ত্র সর্ব্বসাধারণবোধের কঠিনতাপ্রযুক্ত তৎকর্ম্ম সুনিষ্পন্নাভাবে প্রচণ্ডপ্রতাপবান সকল গুণনিধান শ্রীমান মহারাজ নল মহাশয় এবং পাণ্ডবীয় ভীমসেন ও দ্রৌপদী প্রভৃতি স্ব স্ব নামে সূপশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন এবং উত্তরোত্তর সুগমোপায় নিমিত্ত অনেকানেক মহামহোপাধ্যায় মহাশয়েরা নানাবিধ কুতূহল নামে সূপশাস্ত্র প্রকাশে সুলভাধিক্য করিয়াছেন। তৎপরে যবনাধিকারে ঐ সকল সূপশাস্ত্র হইতে প্রয়োজন মতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংগৃহীত হইয়া পারসীয় ভাষাতে গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। এক্ষণে হিন্দু রাজ্য বহুকালাবধি ভ্রষ্ট হওয়াতে ঐ সকল সংস্কৃত সূপশাস্ত্র এতদ্দেশে প্রায় লোপ হইয়াছে, অতএব মহানুভব শ্রীযুক্ত বিক্রমাদিত্য মহারাজাধিকারে সংস্কৃত সূপশাস্ত্র সংক্ষেপ সংগ্রহ-কর্ত্তা শ্রীযুক্ত ক্ষেমশর্ম্মকৃত ক্ষেমকুতূহলনামক গ্রন্থ হইতে ও শ্রীযুক্ত শাহজাহান বাদশাহের নিত্য ভোজনের নেয়ামৎখান নামক পারসীয় পাকবিধি ও নওয়াব মহাবৎ জঙ্গের নিত্য ভোজনের পাক বিধি হইতে সাধারণের দুষ্কর পাক পরিত্যাগপূর্ব্বক সুলভ পাক যাহা অনায়াসে সম্পন্ন হয় তাহা গ্রহণ করিয়া এবং বর্ত্তমান অনেকানেক সূপকুশল ব্যক্তিদিগের নিকট জ্ঞাত হইয়া বিষয়ীব্যক্তি সকলের সুগম বোধার্থ পরিমাণ সহ পাকবিধি এবং ভক্ষণ জন্য অজীর্ণ হইলে দ্রব্যান্তর ভক্ষণে আশু প্রতিকারক জীর্ণমঞ্জরী গ্রন্থ এবং তদর্থ সংস্কৃত মূল সহ গদ্য পদ্য রচনাতে পাকরাজেশ্বর নাম প্রদান পূর্ব্বক গৌড়ীয় সাধুভাষাতে গ্রন্থ প্রস্তুত হইল ইতি।

৩. *ব্যঞ্জন রত্নাকর*। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীলশ্রীযুক্ত মহ্‌তাবচন্দ্ বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে ও ব্যয় দ্বারা। মুনসি শ্রীমহম্মদী, শ্রীগোলাম রব্বাণী ও শ্রীতারিণীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীশ্রীনারায়ণ হাজরা কর্ত্তৃক নেয়ামৎ খান পুস্তক

হইতে অনুবাদিত হইয়া। কলিকাতা। তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। শকাব্দা ১৭৮০ ইংরাজী ১৮৫৮ ২৬ শ্রাবণ। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৬১ + [৬]

আখ্যাপত্রের পিছনদিকে লেখা আছে : Printed by Anu Vedantuvagees.

সূচীপত্র :

'গ্রন্থ পরিচয়' অংশে আছে :

পূর্ব্বকালে বাদসাহ ও রাজাদিগের অভিরুচিক্রমে নিত্য নিত্য নূতন নূতন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করতঃ প্রথমতঃ রন্ধনাধ্যক্ষ সেই ২ পাক দ্রব্য আহার দ্বারা পরীক্ষা করিলে, বাদসাহ কিম্বা রাজাদিগের ভক্ষণীয় রূপে গৃহীত হইত, যেহেতু আহারের দ্রব্যে বিষাদি-প্রাণঘাতক বস্তু মিশ্রিত করিয়া প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনাও ঘটাইতে পারে, এই নিমিত্ত সাজাহন বাদসাহের রন্ধনাধ্যক্ষ "নিয়ামৎ খাঁন আলি" নামক কোন ব্যক্তি অতি নিপুণ ভাবে পাক কর্ম্ম সম্পন্ন করাইয়া স্বয়ং আস্বাদন দ্বারা তাহার পরীক্ষা করিলে, পরে সাজাহন বাদসাহ ভোজন করিয়া যে যে ব্যঞ্জনকে উত্তম কহিয়াছিলেন, সেই সকল ব্যঞ্জনের নাম সম্বলিত, করণ ক্রিয়া লিখিয়া এক পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করেন, অতএব পুস্তকের নাম "নিয়ামৎখাঁন" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে, মূল পুস্তকে যে প্রকার দ্রব্যাদির বিন্যাস, আনন্তর্য্য, এবং পরিমাণ লিখিত আছে, এই পুস্তকে বঙ্গ ভাষায় তাহার অবিকল অনুবাদ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রধান লোকের মুখের আস্বাদের সহিত যদি কোন কোন অম্ল ঘৃতাদি ভোজীর আস্বাদের ঐক্য না হয়, তবে সেই ২-দ্রব্যের তারতম্য করিতেও যদি রুচি হয়, তাহাতে মূল পুস্তকের হানি কি ? যেহেতু বর্দ্ধমান মহারাজ বাহাদুরের আজ্ঞাতে রন্ধনাধ্যক্ষ, দ্বারা প্রত্যেক ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে

মহারাজ বাহাদুরের অভিপ্রায়ে কোন কোন দ্রব্যের তারতম্য করাতেও আস্বাদ পরিপাটীর ত্রুটি জন্মে নাই।

সূপকরণ বিদ্যার বিশেষ রূপে আলোচনা দ্বারা পুরাকালীন সভ্য ধীসম্পন্ন নল, যুধিষ্ঠির এবং বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি মহীশ্বর গণে রন্ধন প্রণালির উৎকর্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এজন্য অধুনা বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ তদ্বিষয়ে উৎসুক হওত, পরীক্ষা করিয়া মুন্‌শী মহম্মদী খোশনবিশ ও শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মুন্‌শী গোলাম রব্বাণী এবং শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ হাজরা দ্বারা অনুবাদিত করিলেন।

দ্বিতীয় সংস্করণ :
ব্যঞ্জন রত্নাকর। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহ্‌তাবচ্‌ন্দ বাহাদুরের অনুমতিক্রমে ও ব্যয়ে শ্রীমুন্সি মহম্মদী, শ্রীগোলাম রব্বানি ও শ্রীদুর্গানন্দ কবিরত্ন দ্বারা বিবেচিত ও সংশোধিত হইয়া বর্দ্ধমান সত্যপ্রকাশ-যন্ত্রে পুনর্মুদ্রিত হইল। শকাব্দাঃ ১৭৮৭। ২৭ আষাঢ়। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৭৪
'বিজ্ঞাপন' অংশে লিখিত আছে :

এই ব্যঞ্জন রত্নাকর পুস্তক ১৭৮০ শকাব্দে নেয়ামৎ খান নামক পারস্য পুস্তক হইতে শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অনুমতি ক্রমে ও ব্যয়ে অনুবাদিত হইয়া মুদ্রিত হয়। তাহা সমস্তই বিতরিত হইয়া গিয়াছে। বিশেষত তাহাতে দ্রব্যের পরিমাণ মাত্র লিখিত ছিল, চূর্ণ কি অখণ্ড কি কুট্টিত, তাহার কোন বিশেষ নির্দ্দেশ ছিল না, এই নিমিত্তে মূল পুস্তকের সহিত ঐক্যমতে সেই সকল বিবরণ লিখিয়া সংশোধন পূর্ব্বক পুনর্মুদ্রিত করা হইল।

শ্রীদুর্গানন্দ কবিরত্ন।

৪. *পুরনো লখনউ* [গুযিশ্‌তা লখনউ]। আবদুল হলীম 'শরর্‌'। অনুবাদক : মুনীরা খাতুন, গুরুদাস ভট্টাচার্য। নয়া দিল্লী। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, 1974 (শকাব্দ 1896)। পৃষ্ঠা সংখ্যা : তেরো + 394। দাম : 13.50
সম্প্রতি একটি ইংরিজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে :
Lucknow : The Last Phase of an Oriental Culture, Abdul Halim Sharar [1860-1926]. Edited and translated from Urdu by E.S. Harcourt, late tutor of Urdu and Persian, and Fakhir Hussain, former Senior Lecturer, St. Mary's College, London, OUP, Oxford India Paperbacks, 21.5 × 14 cm, 300 pages, March 1994, £ 7.95.

৫. শরৎকুমারী চৌধুরানীর *শুভবিবাহ* বইটির ১৯০৬-এর সংস্করণ (মজুমদার লাইব্রেরি) আমরা দেখিনি। তবে সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী* বইয়ে [কলকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, শ্রাবণ ১৩৫৭] *শুভবিবাহ* -এর ১৯০৬ সালের পাঠ গৃহীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- কৃত *শুভবিবাহ*-এর সমালোচনা *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার আষাঢ় ১৩১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল [দ্র. 'শুভবিবাহ', *রবীন্দ্ররচনাবলী* ১৩, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ ৯৫৮-৬০]। *Modern Review* পত্রিকায় [Vol. I, No. 5, May 1907, pp. 505-06] দীনেশচন্দ্র সেন *শুভবিবাহ*-এর একটি সমালোচনা করেন। নীচে সেটি দেওয়া হল :

Shubha Bibaha—By a Hindu Lady. Published by the Proprietors of the Mozumdar Library, Cornwallis Street, Calcutta.

We have no hesitation in recommending this book as a first-class work of fiction. The authoress has by this small book well established her position in Bengali Literature. The work is one of unassuming art, the glory of the writer resting essentially in the cleverness and power with which she hides art. It is a domestic novel and the minutest details of the Hindu home have been, as it were, photographed in it. So vividly do the descriptions recall nature that we hardly recollect any novel in the whole range of our Literature, "Swarnalata" not excepted, which is so intensely realistic; yet the subject is one of commonplace occurance having no touch of romance in it. It is an account of a Hindoo widow's short trip to the houses of her relations, and there is no soul-stirring or sensational event in any portion of the book. Three families are vividly described in it. The first represents pride of wealth, want of proper care and training of children, and irregularity and want of discipline in the management of the house-hold. The mistress of the house, though loving ostentation and display, is not, however, wilfully wicked or sordid and not even without a touch of faith and good breeding. The second family shew, how a home may be made really delightful by discipline and education– but the third claims a conspicuous attention by contrast. Here a Hindoo widow by self-abnegation and faith makes of her lonely house a sort of earthly

paradise. Her asceticism and devotion to God and total disregard of the great riches that she possesses invests the household with a glory which peculiarly belongs to Hindu Homes. The last few pages of the book in which the tide of affairs suddenly takes a new turn are sanctified by a spirit of benefaction which solves one of the greatest problems of a Hindoo home — viz., home the marriage of a daughter under peculiarly difficult circumstances, and the book terminates in happiness.

In these days when sensational writings are the craaze of our readers, it may be difficult to secure the well deserved appreciation of the intrinsic worth of the book under review from the public, but we are sure that the book will be ever on demand by lovers of works of true art in literature.

৬. *সৌখীন পাকপ্রণালী* (আমিষ নিরামিষ ও মিষ্টান্নাদি সম্বলিত)। শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক সম্পাদিত। দশম সংস্করণ। সি, সি, বসাক এণ্ড সন্স, ১২৭ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। [প্রকাশ তারিখ নেই]। মূল্য : পাঁচ সিকা, বাঁধা দেড় টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৮৪।

৭. *মিষ্টান্ন -পাক*। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। (সম্পূর্ণ)। শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়-প্রণীত। পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। নব সংস্করণ। কলিকাতা। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৩০৫। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩২৯ +xii। [সচিত্র]। মূল্য ১ এক টাকা।
আখ্যাপত্রের পেছনে লেখা :
Calcutta : Printed by S. Bhattacharyya, at the Metcalfe Press 1, Gour Mohan Mukherji's Street
'বিজ্ঞাপন' :
মিষ্টান্ন-পাকের প্রতি জনসাধারণের আদর ও উৎসাহ দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া, এই নব সংস্করণ সাধারণ সমীপে প্রচারিত করিতে সাহসী হইলাম। এই সংস্করণে বিস্তর নূতন নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এক সঙ্গে প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় মিষ্টান্ন-পাক বিষয়ে সাধারণের আদর দর্শন করিলে, সমুদয় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।
২০শে ভাদ্র সন ১৩০৫ সাল শ্রীবিপ্রদাস শর্ম্মা
কলিকাতা

৮. *পাক প্রণালী*-র প্রথম সংস্করণ আমরা দেখিনি। পরিবর্দ্ধিত সংস্করণের বিস্তারিত তথ্য নীচে উদ্ধৃত হল :

পাক-প্রণালী। প্রথম হইতে পঞ্চম খণ্ড। "শুভ-বিবাহ তত্ত্ব" ও "মিষ্টান্ন-পাক" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা। বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়। পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। পঞ্চম সংস্করণ। মূল্য ৩্ তিন টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা : [১৬] + ৫৩৭ + পরিশিষ্ট।

'বিজ্ঞাপন' অংশে আছে :

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" আর্য্য-জাতির ইহা অতি প্রাচীন কথা। শরীর যত্ন করিয়া না রাখিলে যে, অকালে ধ্বংস পাইবে, সে ভাবনা কাহার-ই নাই। খাইতে সকলে-ই জানেন, ভাল খাইতে পারিলে-ই সকলে সুখবোধ করেন ; কিন্তু কিরূপে ভাল খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহার ভাবনা প্রায় কেহ-ই ভাবেন না। এই অভাব দূর করিবার জন্য-ই পাক-প্রণালীর সৃষ্টি। পাক-প্রণালীতে পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য-জাতির রন্ধন-প্রথা লিখিত হইয়াছে।

পাক-প্রণালী পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত ছিল, এবং রন্ধন প্রথা-গুলি যদৃচ্ছভাবে বিন্যস্ত থাকাতে সাধারণের পক্ষে বড়-ই অসুবিধা ঘটিত। এজন্য পাঁচ খণ্ড এক-সঙ্গে, এক-এক প্রকার রন্ধন-প্রথার ধারাবাহিক-ক্রমে প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত এবং অনাবশ্যক বিষয় পরিত্যক্ত হইল, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মহোদয়-গণ পাক-প্রণালীর প্রতি যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকেন, সেই ভরসায় এই নব সংস্করণ সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। ইহাতে দরিদ্রের শাক-সব্জী হইতে ধনীর পোলাও, কোর্ম্মা এবং রোগীর পথ্য-রন্ধন পর্য্যন্ত সমুদায় লিখিত আছে ; কেবল মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবার নিয়ম ইহাতে সন্নিবেশিত না করিয়া "মিষ্টান্ন-পাক" নামক স্বতন্ত্র পুস্তক মুদ্রিত হইল। ইতি, সন ১৩০৪ সাল ২রা পৌষ, কলিকাতা।

শ্রীবিপ্রদাস শর্ম্মা।

দ্বিতীয়বারের 'বিজ্ঞাপন' অংশে আছে :

এই সংস্করণে-ও বিস্তর সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইল। পাক-প্রণালী পূর্ব্বে পঞ্চম খণ্ডে সমাপ্তি হইয়াছিল। তৎপরে কয়েক বৎসরের বিশেষ চেষ্টা এবং অনুসন্ধান দ্বারা বিস্তর অভিনব খাদ্য-পাকের বিষয় সংগ্রহ হওয়ায়, পরে ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ড স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

কলিকাতা শ্রীবিপ্রদাস শর্ম্মা

১৩১৩ সাল, ১৫ই চৈত্র

৯. *পথ্য-রন্ধন*। অর্থাৎ। আয়ুর্ব্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক এবং এলোপ্যাথিক মতে পথ্য রাঁধিবার নিয়ম ও রোগ বিশেষে ব্যবস্থা। "বিনাপি ভেষজং ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।/ নতু পথ্য বিহীনস্য ভেষজানাং শতৈরপি॥"। শুশ্রুতঃ। প্রথম ভাগ। কৃষি-তত্ত্ব, দ্রব্য-গুণ-তত্ত্ব, হালিসহর প্রকাশিকা ও পারস্য-কুসুমের ভূতপূর্ব্বক সম্পাদক এবং পাক-প্রণালী, গৃহস্থালী, আগম ও কাশী-খণ্ডের বর্তমান সম্পাদক। শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ১৫৫/১নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট পাক-প্রণালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা। বহু বাজার, ১৭নং শ্রীনাথ দাসের লেন, বি, কে, দাস এবং কোম্পানির যন্ত্রে, শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। [প্রকাশ তারিখ নেই]। মূল্য : দশ আনা মাত্র। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১২৬।

আখ্যাপত্র :

পরমাত্মীবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু রামযাদব চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের কর-কমলে এই গ্রন্থ প্রীতিময়ী স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সমর্পিত হইল।

'বিজ্ঞাপন' অংশে আছে :

বাঙ্গালা ভাষায় পথ্য-রন্ধন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভোপযোগী একখানিও পুস্তক নাই ; এই অসম্ভাব দূরীকরণ মানসে পথ্য-রন্ধন প্রকাশিত হইল। যাবদীয় বৈদ্যকগ্রন্থ, এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক এবং রন্ধন বিষয়ক বহুবিধ পুস্তক অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কতিপয় লব্ধনামা সুচিকিৎসকের উপদেশও গ্রহণ করা হইয়াছে। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মৎপ্রণীত পাক-প্রণালী ও গৃহ-স্থালী হইতেও কোন কোন প্রবন্ধ ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

সমগ্র পথ্য-রন্ধন এককালে প্রকাশ করিতে অধিক সময় সাপেক্ষ এবং পুস্তকের মূল্যও অধিক হইয়া উঠে, সুতরাং সাধারণে পুস্তক পাঠে অসমর্থ হইবেন এই আশঙ্কায় প্রথম ভাগ পথ্য-রন্ধন প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় ভাগ যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই উহা সাধারণের গোচরে উপস্থিত হইবে। দ্বিতীয় ভাগ পথ্য-রন্ধনে রোগ বিশেষে পথ্যের ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে।

উপসংহারকালে বক্তব্য যদি পথ্য-রন্ধন পাঠে কাহারও কিঞ্চিৎমাত্র উপকার হয় তাহা হইলেই সমুদয় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কলিকাতা। বিপ্রদাস শর্ম্মা

১০. *আমিষ ও নিরামিষ আহার*। প্রথম খণ্ড। [আখ্যাপত্র ছিন্ন] প্রকাশ : [১৩০৩/০৪ ?]। উৎসর্গ : "আমিষ ও নিরামিষ আহার" এই গ্রন্থখানি পরলোকগত পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশে স্বধাস্বরূপ উৎসর্গীকৃত হইল।

[প্রজ্ঞা] কাঙ্ক্ষিণী শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪ + [৬] + ৩৮৫ (পরিভাষা সহ)।

আমিষ ও নিরামিষ আহার। দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী প্রণীত। কলিকাতা। ৩৭৪ নং আপার চিৎপুর রোড, জোড়াসাঁকো, 'পুণ্য যন্ত্রে' শ্রীএবাদত খাঁ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। চৈত্র সন ১৩০৯ সাল। মূল্য : দেড় টাকা। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী লিখিত 'মুখবন্ধ' সহ। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১, ৩৮৬-৭১৭।

আমিষ ও নিরামিষ আহার। তৃতীয় খণ্ড। প্রথম সংস্করণ। আমিষ খণ্ড। শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী প্রণীত। হাওড়া, বৃটীশ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত। আশ্বিন, ১৩১৪ সাল। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৭১৮-১৫২৬। মূল্য : ৩ টাকা। প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী-লিখিত 'বিজ্ঞাপন'।

পুনর্মুদ্রণ [আনন্দ সংস্করণ]

ক. *আমিষ ও নিরামিষ আহার।* প্রথম খণ্ড (নিরামিষ)। জানুয়ারি ১৯৯৫। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫০২। দাম : ১০০.০০।

খ. *আমিষ ও নিরামিষ আহার।* দ্বিতীয় খণ্ড (আমিষ)। মে ১৯৯৫। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৭৯। দাম : ১০০.০০

১১. *জারক : আচার ও চাটনি* বইটি ১৯২৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। তবে আমরা বইটির প্রথম সংস্করণ দেখিনি। জুন ১৯৯৫-এ আনন্দ পাবলিশার্স এই বইয়ের একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন (পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৯৬, দাম ৫০.০০)। প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন' অংশটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। নীচে সেটি দেওয়া হল:

রসনার তৃপ্তির জন্য আচার ও চাটনির রচনা। আমরা যখন থালা সাজাইয়া লোককে আহার করিতে দিই, যত প্রকার খাদ্যের ক্রমণী দিই না কেন, মুখের তৃপ্তির জন্য শেষে আচার কি চাটনিটুকু দিয়া থাকি। তৃপ্তির সহিত আহার করিলে সহজে খাদ্যও পরিপাক হয়। ইহা ছাড়া এমন অনেক আচার ও চাটনি আছে, যাহা আহারের পর অল্প মাত্র খাইলেই গুরুপাক খাদ্যও জীর্ণ হইয়া যায়।

প্রতীচ্যের আহারেও মাংসাদির সহিত মুখরোচক স্যালাড এবং নানাবিধ সসাদি দিয়া খাদ্যের সোহাগ বৃদ্ধি করা হয়।

আমি এ যাবৎ সকলকে কত প্রকারের নিরামিষ ও আমিষ আহার খাওয়াইয়াছি। রসনার তৃপ্তির জন্য এবং মনের পরিতৃপ্তির জন্য সকলের সম্মুখে এবারে আচার ও চাটনি ধরিলাম।

স্নেহাস্পদ শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ দুয়রা এই পুস্তকখানি ছাপিবার বিষয়ে আমাকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছেন।

সম্বলপুর গ্রন্থকর্ত্রী

ভাদ্র ১৩৩৪ সন

১২. *আমিষ ও নিরামিষ আহারের সংক্ষিপ্ত*। শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী প্রণীত। প্রথম সংস্করণ। হাওড়া। দি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র কুণ্ডু দ্বারা মুদ্রিত। টিম্বার এণ্ড ষ্টোর এজেন্সি হইতে প্রকাশিত। চৈত্র, ১৩২১ সাল। মূল্য : ২৲ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩০৪।

'বিজ্ঞাপন' অংশে আছে :

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য এই সংক্ষিপ্ত আমিষ ও নিরামিষ আহার গ্রন্থ রচিত হইল। আমার পূর্ব্ব রচিত তিন খণ্ড আমিষ ও নিবামিষ আহার গ্রন্থ হইতে যদিও গুটিকতক মাত্র রন্ধন প্রকরণ এই পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তবু সেগুলি ছাড়াও অন্যান্য অনেক নূতন নূতন রান্না এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ভাত হইতে জলপানের আহার পর্য্যন্ত সকল খাদ্যেরই কিছু না কিছু সংক্ষেপভাবে ইহাতে দেওয়া গিয়াছে। তাহা ভিন্ন ঘরকন্না করিতে গিয়া আমাদের নিত্য যে সকল জিনিসের আবশ্যক হয়, এবং সেই সঙ্গে দু চারিটি শাদাসিদা ঔষধপত্র যাহা আমাদের হাতের কাছে থাকিলেও সময় মত আমরা ব্যবহার করিতে জানি না, অথবা খুঁজিয়া পাই না, সেই রকম কাজের কথাও অল্প স্বল্প ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইল। ভাঁড়ারের হিসাব ও পরিমাণ এবং বড় ভোজে ক্রমণী করিয়া তাহার ব্যয়াদির বিষয় বুঝাইয়া লিখিবার জন্য অনেকে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই জন্য সেই সকল বিষয়কেও সাধ্যমতে সহজ ভাবে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করা গেল।

পাঠক পাঠিকা যাহাতে আরো সহজে রন্ধন বিষয়টা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তজ্জন্য ইহাতে গুটিকতক ছড়াও লিখিয়া দিলাম। এখন ছোট বড় সকলের ইহা আদরণীয় হইলেই আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

লবেল্‌স গ্রন্থকর্ত্রী

২২নং রোজমেবি লেন।

হাওড়া।

১৩. দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : "নাতবউ", 'প্রহাসিনী', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৩৯৫, পৃ. ৪৮। [২২ নং টীকা দ্রষ্টব্য]।

১৪. *বরেন্দ্র রন্ধন*। কিরণ লেখা রায় সঙ্কলিত। কলিকাতা। ২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট ভারতমিহির যন্ত্র হইতে শ্রীবিজয়কুমার মৈত্র দ্বারা প্রকাশিত ও শ্রীহরিচরণ রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত। ১৩২৮। মূল্য আড়াই টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩০৭

উৎসর্গ পত্র

পরমকল্যাণীয়া

শ্রীমতী ললিতা, শ্রীমতী উমা ও শ্রীমতী অপরাজিতা

করকমলেষু

তোদের মায়ের নিকট হইতে কোনরূপ শিক্ষালাভ করার সৌভাগ্য তোদের ঘটিল না। এক্ষণে তোদের জননীর সযত্ন সঙ্কলিত তোদের 'জনক-ভূর' এই 'রন্ধন'খানি তোদের হাতে দিলাম ; ইহা দ্বারা যদি কিছু শিখিতে নাও পারিস তথাপি ইহা হাতে লইলে 'মা'র কথা মনে পড়িবে। ইতি—

দয়াবামপুব, আশীর্ব্বাদক

জেলা রাজসাহী। শ্রীশরৎকুমার রায়

বৈশাখ, ১৩২৮ সাল

'সূচনা' অংশে আছে :

বরেন্দ্রের (বর্ত্তমান উত্তর বঙ্গের) সকল প্রকার লোক-তত্ত্ব ও পুরা-তত্ত্ব উদ্ধার মানস করিয়া আমি আমার স্ত্রী কিরণ লেখা রায়ের উপর বরেন্দ্রে প্রচলিত প্রবাদ, ব্রত-কথা, উপকথা, রন্ধন-প্রথা, 'স্ত্রী-আচার' প্রভৃতি লৌকিক ও সামাজিক তথ্য সংগ্রহ কার্য্যের ভারার্পণ করি। তিনি এই সংগ্রহ কার্য্যে অনেক দূর অগ্রসর হওয়ার পর গত ১৩২৫ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে সহসা কালগ্রাসে পতিত হয়েন ; সুতরাং তাঁহার আরব্ধ কার্য্য আর শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহার সকল শ্রম ও যত্ন ব্যর্থ হইবার উপক্রম হয় দেখিয়া আমি ভ্রাতুষ্কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ঊষাপ্রভা এবং কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ললিতার অনুরোধে তাঁহার সযত্ন সংগৃহীত রন্ধন সম্বন্ধীয় নোট গুলি গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করিয়া 'বরেন্দ্র রন্ধন' নাম দিয়া প্রকাশ করিলাম।

বরেন্দ্রে প্রচলিত রন্ধন-প্রণালী ব্যতিরেকে আমার স্ত্রী বারাণসী* প্রভৃতি স্থানে যে দুই চারিটি অপরবিধ রন্ধন শিক্ষা করিয়াছিলেন নোট মধ্যে থাকায় তাহাও এই গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিলাম। বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্তা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর নির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিয়া ও আধুনিক রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া

* আমার পত্নীর কৈশোব ও শেষ-জীবন বারাণসীতে অতিবাহিত হয়।

আধুনিক রন্ধন হিসাবে এই গ্রন্থকে পূর্ণাবয়ব করিবার নিমিত্ত সচরাচর প্রচলিত কতিপয় ইউরোপীয় এবং ইসলামীয় রন্ধনও এই গ্রন্থ'মধ্যে লিপিবদ্ধ করা গেল। বরেন্দ্র বহির্ভূত এই সকল রন্ধনগুলি বরেন্দ্র প্রচলিত রন্ধন হইতে যাহাতে চিনিয়া লইবার ব্যাঘাত না ঘটে তন্নিমিত্ত প্রতিস্থলে তাহা স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তবে ঐ সকল বরেন্দ্র বহির্ভূত রন্ধন যে যে অধ্যায়ে লিখিলে তাহা বরেন্দ্র রন্ধনের সহিত কতকটা খাপ খাইতে এবং তাহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে বিবেচনা করিয়াছি তদনুসারে তাহা বিভাগ করিয়া সেই সেই অধ্যায় ভুক্ত করিয়াছি।

বরেন্দ্র-প্রচলিত রন্ধন হিসাবে এই গ্রন্থ যে পূর্ণাবয়ব হইয়াছে একথা বলিতে আমি সাহস করি না। পরন্তু আমার স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে এতদ্বিষয়ক সংগ্রহই অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে ; অপিচ তিনিও যতটুকু জানিতেন তাহাও আমি সম্পূর্ণ জ্ঞাত হইতে পারি নাই। তাঁহার ত্যক্ত কাগজ-পত্রাদি হইতে আমার ক্ষমতায় যেটুকু উদ্ধার সাধন সম্ভবপর হইয়াছে মাত্র তাহাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি ; সুতরাং বহুক্ষেত্রে যে এই গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমাদের পরিবারে আমার পত্নীর রন্ধন নিপুণতার যে একটু খ্যাতি জন্মিয়াছিল তাহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি হাসিয়া কহিয়াছিলেন, "পাচিকার প্রধানতঃ দুইটি গুণ থাকা প্রয়োজন ; একটি রন্ধনের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ বা শ্রদ্ধা, অপর, রন্ধনকালে তৎপ্রতি গভীর মনঃসংযোগ।" আমার পত্নীর অটল ধৈর্য্যশীলতা দেখিয়া আমার বোধ হয়, সুপাচিকার তৃতীয় গুণ ধৈর্য্যশীলতাও বটে।

দয়ারামপুর, জেলা রাজসাহী
বৈশাখ, ১৩২৮ সাল

শ্রীশরৎকুমার রায়
(দিঘাপতিয়া)

১৫. *রকমারি নিরামিষ রান্না*। রেণুকা দেবী চৌধুরানী। কলকাতা। সুবর্ণরেখা। প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৮। উৎসর্গ : এ যুগের রাঁধুনি ও খাদ্য-রসিকের জন্য। প্রকাশকের নিবেদন এবং গ্রন্থকর্ত্রী লিখিত 'আমার কথা'। পৃষ্ঠা সংখ্যা : [ম] + ৪২০ + পরিশিষ্ট [১], [২], [৩]। দাম : ৫০.০০।

১৬. *জল খাবার*। কিরণ লেখা রায় সঙ্কলিত। কলিকাতা। ২নং বেথুন রো, ভারতমিহির যন্ত্র হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রকাশিত ও শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত। ১৩৩১। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৪৩। মূল্য : দুই টাকা।

১৭. *লক্ষ্মীশ্রী*। বনলতা দেবী [আমাদের দেখা কপিতে আখ্যাপত্র নেই]। 'বর্ত্তমান সংস্করণ সম্বন্ধে দুই একটী কথা'-তে লেখিকা বলেছেন :

গ্রন্থখানি বহুদিনই ফুরাইয়া গিয়াছিল কিন্তু কতকগুলি নূতন রন্ধন প্রণালী সন্নিবেশিত করিবার চেষ্টা করায় পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে এত বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থখানি মেয়েদের যেরূপ প্রিয় ও উপযোগী হইয়াছে তাহাতে উৎসাহিত হইয়া এবারে গ্রন্থখানিকে বিষয় বাহুল্যবশতঃ প্রায় দ্বিগুণ কলেবর করা হইয়াছে তত্রাচ যদি কেহ এই গ্রন্থখানির অন্তর্গত বিষয়সমূহ আরও ভালরূপ জানিতে চাহেন 'তাহা হইলে তাঁহারা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিবেন ১। Feeding and Care of Baby by F.T. King. ২। Mrs Wilson's Cook Book. ৩। How to Make Indian Chutneys. ৪। Mrs Beetan's Family Cookery. ৫। Three Hundred Sixty Five Dinner Dishes. ৬। Williams. ৭। Everyday Menus for India. ৮। InvalidCookery. আশাকরি এবারে পুস্তকখানি সাধারণের মধ্যে আগের মত আদৃত হইবে।

এই পুস্তকে যে সকল রন্ধন-প্রণালী প্রদত্ত হইল সে সকল ভাত ডাল রাঁধার ন্যায় অত্যন্ত সহজ ও মোটেই ব্যয়সাধ্য নহে। এবং ইহাতে যে সকল উপদেশ আছে সে সকল শুধু পড়িয়া গেলে হইবে না, সুগৃহিণী হইবার জন্য সদ্‌ইচ্ছা ও শুভকামনা লইয়া সে সকল মনে রাখা ও তদনুসারে সতত কার্য্য করিতে চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। তাড়াতাড়িবশতঃ সমস্ত অধ্যায়গুলি গুছাইয়া সাজানো হয় নাই। ইতি— বিনীত

১.৩.২৪ গ্রন্থকর্ত্রী

এই বইটির পঞ্চম সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৪২-এ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশক ছিলেন— শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগ্‌চী, রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়, ১৪/১বি ভুবনমোহন সরকার লেন, কলিকাতা। দাম ছিল দু টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২২২।

১৮. *খাদ্য—সুস্থ ও অসুস্থ শরীরে*। ডাক্তার সরল রঞ্জন দাশগুপ্ত, এল. এম্. এস্, রিটায়ার্ড চিফ্ মেডিকেল অফিসার, মহারাজা স্যার পদ্ম সম্‌শের জং বাহাদুর রাণা— জি. সি. বি. ; জি. সি. এস্. আই. ; জি. বি. ই. ইত্যাদি— মহারাজা এবং প্রধানমন্ত্রী নেপাল। এবং মহারাজা স্যার মোহন সমশের জং বাহাদুর রাণা— কে. সি. এস্. আই ; কে. বি. ই. ইত্যাদি— প্রধানমন্ত্রী এবং মহারাজা— নেপাল— প্রকাশক : শ্রীসুনীল রঞ্জন দাশগুপ্ত, এম্. এস্. সি. দাশগুপ্ত ব্রাদার্সের পক্ষে 'তেলিরবাগ ভবন' পি ৩, শশিভূষণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। চৈত্র ১৩৬৮। পৃষ্ঠা সংখ্যা : [ণ] + ৩২০। দাম : ৪.৫০।

১৯. *রান্নার বই* [৫০০ রকম রান্নার প্রকরণ সম্বলিত]। সুলেখা সরকার। কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। প্রথম সংস্করণ : চৈত্র ১৩৬০। পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৩৭৩। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩১৫। মূল্য : ছয় টাকা।

২০. *আচার ও মোরব্বা*। স্নেহলতা দেবী লিখিত। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। [প্রকাশ তারিখ নেই]। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১০২। দাম : এক টাকা চার আনা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভূমিকা সহ।

ভূমিকা :

সাহিত্য যার পেশা, তার পক্ষে আচার ও মোরব্বার মত মুখরোচক জিনিষের আলোচনা অস্বাভাবিক ঠেকলে আমি নাচার। এ আলোচনা করবার জন্যে কোন কৈফিয়ৎ দেবারও আমি প্রয়োজন বোধ করি না। তবে অধিকার সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন ওঠে, তাহলে বলতে পারি—সাহিত্যে যার রসবোধ আছে, তার রসনা নেই এমন অপবাদ অমূলক। এমন কি রসবোধ থেকে রসনাবিলাস খুব বেশী দূর নয় বলেই আমার ধারণা এবং সকল প্রকার রসের একটা আত্মীয়তা আছে বলে আমি মনে করি। সেদিক থেকে বিচার করলে মনে হয়, শুধু উপাদানের উপর জোর দিয়ে কাব্যের সঙ্ঘাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করে রাখা অন্যায়। শুধু ভাষা নয়, কাব্য আরো অনেক কিছুর সাহায্যেই সৃষ্টি হতে পারে—সৃষ্টি প্রতিভা যদি থাকে। কবিতা শুধু কাণে শুনে মন দিয়েই উপভোগ করা যায় এমন কি কথা আছে ; ওস্তাদ বাজীকরের হাতে আঁধার রাতের পটে রঙীন স্ফুলিঙ্গে রচিত চোখে দেখার কবিতা আমরা উপভোগ করি, গুণী আতরচির হাতে সুগন্ধ সঙ্গীত হয়ে ওঠে, ক্ষুধা নিবারণের উদ্দেশ্য ছাড়িয়ে ভোজ্য জিনিষ রসনা দিয়ে উপভোগ করবার কাব্য হয়ে উঠতেও আমরা জানি। সাহিত্য-রসের রসিক হয়ে রসনার কাব্য-রচনাকে সুতরাং অসঙ্কোচে তারিফ করা যায়।

যে বইটির ভূমিকা লিখছি, সেটিকে রসনার কাব্য-সংগ্রহ বলা যায়। বাঙালী শুধু সাহিত্য-রসিক নয়, তার রসনাও সূক্ষ্ম বলে একটা আন্তর্প্রাদেশিক খ্যাতি আছে। রন্ধন-কলায় বাঙালী গৃহিণীরা এমন সব উদ্ভাবন ও আপাতঃ বিরোধী সামঞ্জস্য বোধের পরিচয় দিয়েছেন, যা' অন্য কোথাও দুর্লভ। কিন্তু বাঙালী রসনার ক্ষেত্রেও প্রাদেশিক নয়। অন্যের সার্থক সৃষ্টিকে গ্রহণ করা ও নিজের প্রতিভায় তাকে নূতন উন্নত রূপ দেওয়া তার বিশেষত্ব। এই বইখানিতে দেশী ও বিদেশী আচার ও মোরব্বা জাতীয় কোন কিছু বাদ পড়েছে বলে ত' মনে হয় না। জাতি-ভেদের বালাই এখানে নেই।

রসনা-সাহিত্যে অন্নব্যঞ্জনকে যদি গল্প উপন্যাস বলা যায়, তাহ'লে আচার ও মোরব্বা তার গীতিকাব্য। যার সরসতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, এমন কাব্যসংগ্রহ রসিক সমাজে উপস্থিত করতে পেরে আমি খুসী।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

২১. *ঠাকুরবাড়ির রান্না*। পূর্ণিমা ঠাকুর। কলকাতা। আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড।

প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৮৬, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ: নভেম্বর ১৯৮৮। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৯৭। দাম : ১২ টাকা।

২২. *পাঁচমিশালি*। তনুজা দেবী। কলকাতা। প্রকাশক : সুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, ২২ প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ট্রীট। শ্রাবণ ১৩৫৬। মুখপত্র : ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। সূচিপত্র ও সাপ্তাহিকী [৭ দিনের খাওয়ার ছক] -সহ। দাম: আড়াই টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১১২।
নীচে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী লিখিত ভূমিকাটি উদ্ধৃত হল :

একটি ইংরেজী প্রবাদকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বলা যেতে পারে যে, খাওয়াতেই খাদ্যের পরিচয়। অথবা খেয়ে দেখাই খাবারের ভালোমন্দের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।
এক্ষেত্রেও তাই বলি যে, রান্নার বইয়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে ব্যঞ্জন রেঁধে খেয়ে দেখলে তবেই বইটির যথার্থ পবিচয় পাওয়া যাবে। তা' ভিন্ন লিখিত ভূমিকা বাহুল্য মাত্র।
তবু যদি রন্ধনবিদ্যায় আমার কিছুমাত্র অধিকার থাকত, তাহলেও না হয় সে বিষয়ে দু'কথা বলা শোভা পেত। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি যে, আমাদের কালে স্কুলের পাঠ্যতালিকার মধ্যে রন্ধন স্থান পায়নি ; বা পরবর্ত্তী জীবনে তাকে আয়ত্ত করবার যথেষ্ট চেষ্টাও করিনি। সে জন্য আজ পর্য্যন্ত আমি আন্তরিক লজ্জিত ; কারণ এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক স্ত্রীলোক বা ভাবী গৃহিণীর এই অতি প্রয়োজনীয় বিদ্যা সম্বন্ধে অন্ততঃ সাধারণ ধারণা থাকা নিতান্তই উচিত।
এ-হেন অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে যে আমার নাতিনী-স্থানীয়া কল্যাণীয়া শ্রীমতী তনুজা দেবী তাঁর রান্নার বইয়ের ভূমিকা-লেখিকা স্বরূপ মনোনীত করেছেন, সে একমাত্র তাঁর অহেতুকী-ভক্তি ভিন্ন আর কোন কারণে হতে পারে না। আমিও সেইরূপ স্বাভাবিক স্নেহবশতঃ এই অনধিকার-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হয়েছি। তা'ছাড়া ভেবে দেখলুম যে, দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে না থাকলে যেমন দানকার্য্য সম্পন্ন হতে পারে না, তেমনি পাচক ও ভক্ষকের শুভসম্মিলনেই রন্ধনকার্য্যের সার্থকতা। তাই রন্ধনপটু না হলেও ভোজন পটু যদি হয়, তবে রন্ধনশালায় তার প্রবেশ নিষেধ নিশ্চয়ই হবে না। "পাঁচ-মিশলি" নামেতেই প্রকাশ যে, যার যেমন অভিরুচি সে তেমনি রান্নার ব্যবস্থা এই বইয়ে পাবে। আমিরী কালিয়া পোলাও থেকে ফকিরী শাকান্ন পর্য্যন্ত, যার যেরকম অবস্থা, অভ্যাস, পছন্দ ও ক্ষমতা (বিশেষতঃ হজমের!) সে সেইরকম খাবার বেছে নিয়ে রাঁধতে, খেতে ও খাওয়াতে পারবে। রান্নার বই বাঙ্গালা দেশে নতুন নয়— ইতিপূর্ব্বেও বেরিয়েছে, পরেও বেরবে ; কারণ বাঙালী স্বভাবতঃ ভোজন-বিলাসী জাত ও সর্ব্বদেশকালের মুখরোচক খাদ্য সমভাবে আত্মসাৎ করতে ওস্তাদ। তবু

প্রত্যেকের হাতের রান্নায় যেমন, প্রত্যেকের লিখিত রন্ধন-পদ্ধতিতেও কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে বাধ্য।

সেই দিক থেকে দেখেই আমি বাঙ্গালার জনসাধারণের কাছে এই পুস্তিকার ভাগ্যপরীক্ষার যাত্রাকালে "শুভমস্তু" মন্ত্রোচ্চারণ করতে এসেছি। তনুজা দেবী নানা চারুশিল্পে যেমন সুনাম অর্জন করেছেন, আশা ও আশীর্ব্বাদ করি রন্ধনরূপ মহা কারুশিল্প ক্ষেত্রেও তেমনি কালিযা পোলাওয়ের সুগন্ধের সঙ্গে মিশে তাঁর যশের সৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং ঘরে ঘরে আনন্দ বিতরণ করবে। সর্ব্বোপরি তাঁর বইয়ের জয়পতাকা হয়ে থাকবে তাঁর অমর পূর্ব্বপুরুষের আদরের আশীর্বাণী।

জোড়াসাঁকো লেন, আষাঢ় ১৩৫৬ — শ্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

তনুজা দেবীর *পাঁচমিশালি* বইটিতে স্বহস্তে লিখিত রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী কবিতার একটি প্রতিচিত্র সংযুক্ত আছে। কবিতাটি এরকম:

কল্যাণীয়া

তনু,

অন্তরে তব স্নিগ্ধ মাধুরী পুঞ্জিত,
বাহিরে প্রকাশ সুন্দর হাতে সন্দেশে।
লুব্ধ কবির চিত্ত গভীর গুঞ্জিত,
মুগ্ধ মধুপ মিষ্ট রসের গন্ধে সে।
রবিদাদারে যে ভুলালে তোমার নাতিত্বে
প্রবাসবাসের অবকাশ ভরি আতিথ্যে,
সেই কথাটুকু গাঁথি দিল এই ছন্দে সে

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০ — শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রহাসিনী কাব্যগ্রন্থের 'নাতবউ' কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তির সঙ্গে এই আশীর্বাণী-সূচক কবিতাটির পাঠভেদ আছে। [এই প্রবন্ধের ১৩নং টীকা দ্রষ্টব্য]।